শাস্ত্রে কথিত আছে, অমরনাথ কৈলাস পর্ব্বতে স্থিত। হিমাচলের কোন্ শিখরটী খাস কৈলাস, অমরনাথ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তাহার দ্বারে রসলিঙ্গ রূপে চিরদিন অবস্থিতি করিতেছেন। সে পথে যাইবার জন্য বহুকাল হইতে মুনিঋষিগণ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, প্রায় ৫০০০ বৎসর অতীত হইল, আর্য্যকুলতিলক মহারাজ যুধিষ্ঠির এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। যে স্থান হইতে অমরাবতী গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া অমরনাথের পদ ধৌত করিতেছেন, সেই স্থানই তাঁহাদিগের প্রস্থানপথ। লোকে অনুমান করে,(পাণ্ডারা

করে। ঘ্রাণ, নিশ্বাস প্রশ্বাসকে বিশুদ্ধ করে, সেই পরিশুদ্ধ বায়ুর এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, তাহার উপর দৃষ্টি পড়িলে অচিরাৎ বায়ু চৈতন্যের সংযম হইয়া আইসে। সেইরূপ হিমালয় ভারতের নাসিকা, তাহার সমস্ত পরমাণু কালে স্ফটিকাকৃতি (Crystallized) হইয়া যে রত্ন রাশি সমাহরণ করিয়াছে, তাহার আকর্ষণ শক্তি অসীম ও অনুপম, এবং সেই আকর্ষণই চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণের ন্যায়, উত্তর হিমালয়ের সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইতে রত্ন উদ্ধার করিয়া কি হইবে? মুখের শোভা নাসিকার লোপ হইলে যেমন প্রাণায়ামের ব্যাঘাত হয়, অতুল, অমূল্য রত্নরাশি হিমালয় গর্ভ হইতে উৎখাত হইলে হিমালয় গহ্বরে গভীর চিন্তার তেমনি ব্যাঘাত হয়। ভারতের ধনকুবের রাজচক্রবর্ত্তীরা প্রাসাদে বসিয়া যোগ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু আয়াসে নবরত্ন শিবলিঙ্গ সেই নিমিত্তই সংগঠন করিতেন। অদ্যাপি পূজাকালে শরীরে কোন এক রত্ন ধারণ করা শ্রেয়স্কর বলিয়া হিন্দুদিগের এক চির সংস্কার আছে। হিমালয়ে সে রত্ন প্রচুর পরিমাণে স্থাপিত থাকায় যোগপ্রবণ জনসাধারণের যে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

এই কথা কহিয়াও থাকে) যদি যত্ন করিয়া অমরনাথের মন্দিরের শিখর দেশে আরোহণ করা যায়, এবং সেখানকার পর্ব্বত প্রমাণ বরফরাশি উৎখাত করা যায়, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের শবদেহ অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে দুর্গম পথে কাহার সাধ্য গমন করে! শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন যখন আমরা অমরগঙ্গাকূলে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন আমাদিগের শরীর শীতে আড়ষ্ট হইতে-ছিল, মন্দিরের শিখরভূমি অসীম তুষার-রাশিতে আচ্ছন্ন ছিল। অমরাবতী গঙ্গা হিমসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহার উপর বহুদূর পর্য্যন্ত বরফে ঢাকিয়া সেতু স্বরূপ হইয়াছিল। কেবল নিম্নদেশ হইতে নির্ঝর বারির ন্যায় ঝর ঝর করিয়া ক্ষীণ রবে প্রবাহিত হইতেছিলেন। মন্দিরের চতুঃসীমা গগনভেদী পর্ব্বত শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল। ভৈরবঘাটী হইতে এই স্থান প্রায় ১১০০০ হাজার ফিট নিম্নে। ভাবুক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ গিরিসঙ্কটে কে সহজে ইচ্ছা করিয়া সংসারের সুখাশা ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিবে? ইউ-রোপীয় শিকারীদিগের এখানে শিকার দুষ্প্রাপ্য। কাশ্মীরের সুগন্ধিময় পুষ্প-উদ্যানের সৌন্দর্য্য এখান হইতে বহুদূরে; ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের পরীক্ষার স্থান অতি দুঃসাধ্য; সুতরাং ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও এখানে আসা সম্ভবপর নহে। তাই নাকি ভূতভাবন ভবানীপতি এই নির্জন স্থানে গভীর যোগ তত্ত্বে সমাহিত থাকিয়া চির দিন ইহাকে অমর-ধাম করিয়া রাখিয়াছেন, তাই নাকি ভৃগু, গৌতম, ’স প্রভৃতি মহর্ষিগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ এই দুর্গম পথ

অতিক্রম করতঃ অমরনাথকে আলিঙ্গন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের উন্নতির দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। তাই ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত ভারতীয় আর্য্যদিগের এত বিভিন্নতা। এক ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত আপনার বিদ্যাবলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত হিমাচলের গভীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া বহুমূল্য রত্নের অনুসন্ধান করিতেছেন। আর একজন কৌপিনধারী আর্য্য ঋষি সে গহ্বরে প্রবেশ করতঃ সমাধিস্থ হইয়া যে রত্ন উদ্ধার করিতেছেন, তাহার মূল্য কত, চিন্তাশীল ভক্তপ্রাণ, ঈশ্বরপরায়ণ মনুষ্যই তাহা বলিতে পারেন। তাই বলিতেছিলাম ভক্ত জগতের আনন্দ কেবল পুষ্পের শোভায় মিলে না, সুন্দর মলয়ানিলে বহে না, রত্ন-খনিতেও দৃষ্ট হয় না. সে কেবল যোগ সাধনের উপায় মাত্র। যতক্ষণ বাহিরে দৃষ্টি থাকে, চিন্তা বাহিরের বিলাসে ভ্রমণ করিতে থাকে, ততক্ষণই তাহার সৌন্দর্য্য থাকে। একবার চক্ষু নিমীলন কর, বাহিরে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়নিচয়কে অন্তরে আকর্ষণ কর, হৃদিস্থিত কামনাপুঞ্জ সংযত করিয়া সেই কমনীয় কান্তি কমলাপতির চরণে অর্পণ কর, তাহার পর আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া তুমি কি আর থাকিতে পারিবে? যাঁহারা এইরূপে এই পথে যাইয়া অমর হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই অমরনাথ লিখিত হইল। ভরসা করি অমরনাথ তাঁহাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া আপনার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করাই-

যার নিমিত্ত অমরধামে অমর-জনবাঞ্ছিত সুখের অধিকারী করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষায় অমরনাথ লিখিব, কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই বরং ইহাই অবধারিত ছিল যে, আমার কোন কোন মাননীয় ইউরোপীয় বন্ধুদিগের আদেশানুসারে হিন্দুভাব সমন্বিত অমরনাথ নাম দিয়া কাশ্মীরের জ্ঞাতব্য বিষয়ে এক খান ক্ষুদ্র পুস্তক লিখি;—এবং তাহার জন্যই বহু আয়াস স্বীকার করিয়া বিস্তর সংবাদসংগ্রহ করি। কিন্তু গত আষাঢ় মাসে গুলমর্গ ভ্রমণ করিতে গমন করিয়া তথাকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমার এক সুপরিচিত স্নেহভাজন বন্ধুকে পত্র লিখি। তিনি সেই পত্র পাঠ করতঃ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে ভূয়োভূয় অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, আমার সহযাত্রী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বরূপানন্দ সরস্বতী তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন, ও অনুরোধ করেন যে, এইরূপে বাঙ্গলা ভাষায় অমরনাথ নামে এক খান পুস্তক লিখিত হয়। তাহার পর পঞ্জাব হইতে এদেশে আসিবার সময় যত দেশীয় বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অল্প বিস্তর সকলেরই সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার চমৎকারিত্বের সমধিক প্রশংসা করায় প্রোৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করি। ইউরোপীয় হিমালয়-ভ্রমণকরীরা কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণীত বহুতর পুস্তক পাঠ করিয়া আরও উৎসাহিত হই।

যতদূর সাধ্য সুললিত ভাষায় লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি, কতদূর তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

কলিকাতা—শোভাবাজার,
১০নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট,
১ লা শ্রাবণ ১৩০২।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

অমরনাথ।

প্রথম অধ্যায়

"দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥
জয় জয় দেব হরে" ॥

তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যমণ্ডলের ভূষণস্বরূপ হইয়া আপনিই জীবের সংসার ভীতি খণ্ডন করিতেছেন, মুনিজনের হৃদয়সরোবরে রাজহংস রূপে আপনিই বিরাজিত রহিয়াছেন। হে দেব, হে হরে! আপনারই জয় ॥

"তব চরণেপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

আমরা আপনার চরণ-কমলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি প্রণত জনগণের মঙ্গল বিধান করুন।

গীতগোবিন্দং।

কশ্যপপুর বা কৈলাস।

শাস্ত্রে কথিত আছে সৃষ্টির প্রথমে, মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে, অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়। লোক-লোকান্তরে সেই আদিত্য মণ্ডল প্রকাশিত রহিয়াছেন। আবার

কল্প-কল্পান্তরে সেই আদিত্য মণ্ডল একত্র হইলেই মহা কালের গর্ভে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। যে আদিত্য আমাদের সৌরজগতে প্রকাশিত থাকিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, সেই আদিত্য এই দ্বাদশ আদিত্যের একটী। সৃষ্টি যখন নবোদিত অরুণ কিরণে প্রভাসিত হইল, তখন নারায়ণ নীর-নীহারে ভাসিতেছিলেন। তখন পৃথিবী সর্ব্বোচ্চ শিখর কৈলাসে প্রকাশিত হইল, ইহার উচ্চতা ২৯০০২ ফিট্। ক্রমে ভবসাগরের জলরাশি যখন চতুর্দ্দিকে সরিতে লাগিল, তখন ভূতভাবন্ ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করিয়া তাহার যে ক্ষেত্রাংশ উদ্ধার করেন, সেই ক্ষেত্রের নাম কাশ্মীর বা কশ্যপ-পুর বলিয়া অভিহিত। এই কাশ্মীর হিমালয়ে অবস্থিত, ইহার উত্তর সীমা আস্তর, গিল্গিট, স্কার্দু এবং তিব্বতের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী; পূর্ব্বাংশে দ্রাজ, সুরু, জানস্কার এবং লাদাক; দক্ষিণে পূঁঞ্চ, নাওশেরা, কিষ্টোয়ার বাদ্রাওয়ার ও জম্বু, এবং বৃটিশ সীমায় ঝিলম্, গুজরাট ও সিয়ালকোট জেলা; এবং ইহার পশ্চিম সীমায় কাগান বৃটিশ রাজ্যের হাজরা ও রাবলপিণ্ডী প্রদেশস্থ পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার পরিধি প্রায় ৮০,৯০০ বর্গ মাইল, বর্ত্তমান জন সংখ্যা ১,৫৩,৪৯৭২। যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ উদ্ধার হয় নাই, তখন এই কাশ্মীর-কৈলাসেই, দেব ও গন্ধর্ব্ব লোক বাস করিতেন, তাহার বহুল চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে উদ্দেশ্যে এই অমরনাথ লিখিত হইল, তৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত বিস্তার পূর্ব্বক অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তকের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মাত্র লিখিতে যত্ন পাইলাম।

কলির আগমনে যখন পৃথিবী কলঙ্ক কালিমায় পূর্ণ হইতে লাগিল, মনুষ্যের প্রকৃতি বিকৃত হইতে লাগিল, লোক-সমাজ পাপজ্বরে আক্রান্ত হইতে লাগিল, তখন দেবগণ মর্ত্ত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যধামে প্রস্থান করিলেন। মুনি ঋষিগণ জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাপ্রস্থানের দ্বারে যে অমরনাথ চির বিরাজিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অমর ধামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, তাঁহার বিষয় বর্ণন করাই আমার উদ্দেশ্য।

হর-পার্ব্বতী সংবাদ।

অমরকথা প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, ভগবতী ভব-ভারে ক্লিষ্ট হইয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে ভূতভাবন ভবানীপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! ভবসংসার পাপ-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে জন্য জনসাধারণ আর শান্তি সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না, কৈবল্যধামের সুখ সৌন্দর্য্য লাভের আশা দূরে থাকুক, তাহারা সংসারে নিরাপদে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জীবনোপায় লাভ করিতে পারিতেছে না, তাই ঐ দেখ, উহাদিগের সুন্দর কান্তি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, মন প্রাণ বিপথে ধাবিত হইতেছে, জ্ঞানের গরিমা ভুলিয়া গিয়া পশুর ন্যায় হিতাহিত বোধ শূন্য হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বিরোধানল প্রজ্জ্বালিত করি-তেছে, করুণাময়ী জননী ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, পালনকর্ত্তা পিতা

অপত্যস্নেহ ভুলিয়া গিয়া রাক্ষসের ন্যায় নিজ উদর পূরণের নিমিত্ত বনে বনে আহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে, রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাই কোথাও শান্তির সুবিমল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না, অকালে জরা, মৃত্যুর প্রতিকৃতি ধারণ করিয়া দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতেছে, তাই শান্তি সুখের চিহ্ন কোথাও দৃষ্ট হইতেছে না, কেবলই গোল, ক্রন্দনের রোল এতদূর আসিয়াও আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে, ত্রিনয়ন! একবার নয়ন উন্মীলন কর, করুণকটাক্ষে দৃষ্টি কর, দেখ সংসার আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছে না। তুমি ত্রিকালদর্শী,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ধাতা, পাতা, ও বিধাতা। তোমার করুণাবলে সংসার সৃষ্ট হইল, সেই করুণা অজস্রধারে বর্ষিত হইয়া এত কাল যে জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছিল, তাহা সংযত করিয়া এ কি বিপদ-পাতের উপক্রম করিলে? তুমি শিবং, সুন্দরং, অপাপবিদ্ধং, তোমাতে সকলই অবস্থিতি করিতেছে, তোমার মহীয়সীশক্তি কে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? জীব জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া তাহাতে চৈতন্য দান করিলে,—দুর্ব্বল জীব তাহা বুঝিতেছে না। দুর্ব্বার ভব-ভারে আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ধন্বন্তরি হইয়া তুমি তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? সংসারের ক্রন্দন কোলাহল গগন ভেদ করিয়া এতদূর আসিয়া আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, আমি আর উহা দেখিতে পারি না, যদি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তবে এ দায় হইতে জীবগণ এবার রক্ষা পায়।

কৈলাসপতি করুণার্দ্র হইয়া প্রসন্ন নয়নে ভগবতীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন,—দেবি! সৃষ্টির আদিতে যখন সংসার জলগর্ভে নিহিত ছিল, তখন ভগবান নারায়ণ স্তম্ভিত থাকিয়া সংসার উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা অতি গূঢ় বিষয়। সামান্য মনুষ্যে কি বুঝিবে,—দেবতারাও তাহার মর্ম্ম হৃদগত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পুঞ্জীকৃত চিন্তা ত্রিধারায় পরিণত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার প্রথম ধারায় ব্রহ্মার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ধারায় বিষ্ণুর উৎপত্তি, তৃতীয় ধারায় আমি মহাকালকে কবলিত করিয়া উদ্ভাসিত হই। সৃষ্টির আদি হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত এই শক্তিত্রয় প্রবাহিত হইতেছে, কাহার সাধ্য ইহার বেগ সম্বরণ করে? এ সম্বন্ধে যে সকল গূঢ় তত্ত্ব আমরা অবগত আছি, তাহা শুনিয়া তোমার কি হইবে? তুমি আদ্যাশক্তি নারায়ণী, নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া স্তম্ভিত হও, বুঝিতে পারিবে।

করুণাময়ী জগৎ-জননী একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কহি-লেন,—ভগবন্! তুমিই শক্তির আধার, পরাৎপর, পরব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্থিতি, পালন ও সংহার কর্ত্তা, তোমার ইচ্ছায় সংসার সৃষ্ট হইল, তোমার একমাত্র কৃপাবলে সংসার স্থিতি করিতেছে, রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন তাহা সংহার কর, কে তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারে? স্বামিন্! সংহার মূর্ত্তি সংহরণ কর, জীবের দুঃখ দুর্দ্দিন আর দেখিতে পারি না, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সংসারে সুদিনের সুপ্রভাত কর, সৃষ্টির আদিতে কি গূঢ় প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিয়া আমার সংশয় দূর কর।

ভগবান প্রসন্ন হইয়া করতালি বাদ্য করিতে লাগিলেন, যত তালে তালে করতালির ধ্বনি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তত সেই ধ্বনি হইতে বজ্রধ্বনিতে কালানল প্রকাশিত হইয়া প্রজ্জলিত হইতে লাগিল, দিগন্ত জ্বলিয়া উঠিল, যে দিকে দৃষ্টি-পাত কর, প্রজ্জলিত দাবানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কৈলাসের পাদদেশ ভস্মাবশেষে পরিণত করিল, তখন শঙ্কর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া কৈলাসেশ্বরীকে কহিতে লাগিলেন—

দেবি! ভীতা হইও না, জন-সমাজ এ গূঢ় তত্ত্বের ভাব অবধারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাই আমি দিগন্ত দাবানলে দগ্ধ করিয়া কৈলাসের পাদদেশ জীব শূন্য করিলাম, এখন বলিতেছি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

ভগবান করুণার্দ্র হৃদয়ে ভবানী সমীপে যে সকল গূঢ় তত্ত্বের বিবরণ কহিলেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য ও অনুপম। দেবী পরিতুষ্টা হইয়া মহাদেবের চরণে প্রণাম করিয়া অভয়ে এই ভিক্ষা চাহিলেন, স্বামিন! আপনার করতলস্থ অনলে যে দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত জীব ধ্বংস হই-য়াছে বটে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীব শুক পক্ষী আপনার সর্ব্বস্ব সেই দাবানলে আহুতি দিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় আমার শরণাগত হইয়াছিল, করুণা পরতন্ত্র হইয়া আমি উহাকে রক্ষা করিয়া-ছিলাম। আপনার অমর কথা শ্রবণ করিয়া এই দগ্ধ জীব পুন-র্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাকে অভয় প্রদান করুন। মঙ্গলালয়ে তখন সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, কৈলাসপতি মঙ্গল মুরতি ধারণ করিয়া কৈলাসেশ্বরীকে প্রসন্ন করিতেছিলেন, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া "তথাস্তু" বলিলেন। দেবী ভগ-

বানের প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এই অবসরে দ্বিতীয় বর এই প্রার্থনা করিলেন,—ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ক্ষুদ্র এই শুকপক্ষীকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়া এই অমর ধামে চিরদিন এই অমর কথা জীবগণকে শুনাইয়া অমর ধামের যাত্রী করিতে সমর্থ করুন। ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া ভগবতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

আমাদের দেশে ব্রতাদি কালে স্ত্রীলোক পরম্পরায় যেরূপ কথা প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, অমর কথাও সেইরূপ সুদীর্ঘ গল্পচ্ছলে বর্ণিত। অবিকল তাহার আদ্যোপান্ত লিখিত হইলে পুস্তক অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে তাহার সার মাত্র সংগ্রহ করিয়া এস্থলে বিবৃত করিলাম। ভাবুক পাঠকগণ তাহা হইতে সমস্ত কথার মূলতত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিবেন।

অমর কথা।

যে স্থানে হর-পার্ব্বতী এই কথা প্রসঙ্গে শুকপক্ষীকে অমরত্ব প্রদান করেন, সেই স্থানের নাম অমরনাথ। এই স্থানের প্রায় ১২ ক্রোশের মধ্যে কোন জীব জন্তু অবস্থিতি করিতে পারে না, এখানকার প্রায় সমস্ত পর্ব্বত উলঙ্গ এবং ভস্মরাশিতে আচ্ছন্ন, বহুকাল হইতে অমরাবতী গঙ্গা প্রবাহিত থাকায় এবং অনবরত তুষার বর্ষণ হওয়ায় ইহার আপাদমস্তক শুভ্র বর্ণে সমাকীর্ণ। ভৈরবঘাটীর শিখরে (এই পর্ব্বত শ্রেণী পৃথিবীর সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ১৮০০০ ফিট উচ্চে) দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সহস্র সহস্র সুনির্ম্মিত মন্দির স্থাপিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহার মধ্যস্থিত একটী মন্দিরে

অমরনাথ রসলিঙ্গ রূপে আবির্ভূত। এই স্থান ভৈরবঘাটী হইতে প্রায় ১১০০০ ফিট্ নিম্নে; নিম্নে অবতরণ করিয়া ক্রমে যত নিকটস্থ হওয়া যায়, ততই পূর্ব্ব ভাব বিলুপ্ত হইয়া গগন-ভেদী পর্ব্বত রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী মন্দিরে স্বাভাবিক গহ্বর আছে, তাহার মধ্যে অমরনাথ বিরাজ করিতেছেন। আর সেই অমর শুক মধুর কণ্ঠে চিরদিন তাঁহার মহিমা গান করিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, মহর্ষি দত্তাত্রেয় স্বামী কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া শারিকাদেবীর প্রসন্নতা লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট অমরত্ব লাভের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করায়, দেবী সুপ্রসন্ন হইয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অমর ধামে যাত্রা করিতে আদেশ করেন। যে পথ অতিক্রম করিয়া এই দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গে অধিরোহণ করেন, তাহার বিপুল চিহ্ন এই পথে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। দত্তাত্রেয় স্বামী মহাযোগী ছিলেন, নিজ যোগবলে এবং শারিকাদেবীর সহায়ে অমরাবতী গঙ্গায় স্নান করিয়া অমর ধামে উপস্থিত হন। তখন সেই চিরঞ্জীব বিহঙ্গরাজ অগ্রসর হইয়া অমরনাথের দর্শনলাভ সুলভ করিয়া দিয়া এবং অমর কথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করেন।

কথাপ্রসঙ্গ।

শুক প্রসন্ন চিত্তে জীবের জীবনোপায়,—যাহা ভগবান ভবানীপতি ভবানীকে কহিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বিবৃত করিলেন,—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের সারোদ্ধার করিয়া কহিলেন, জীব আপনার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া শুভাশুভ ফলের

অধিকারী হইতে চাহে, শত শত বার কালচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া আপনার কর্ম্মচক্রে আপনিই আবদ্ধ হইতেছে, এক-বার ভাবিয়া দেখে না তাহার অস্তিত্ব কোথায়? চিন্তা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এতদূর যাইয়া পড়ে যে, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার আশা আর রাখিতে পারে না। ভবঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘটনা-স্রোতে এতদূর যাইয়া পড়ে যে, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার আর উপায় চিন্তা করিতে পারে না, তাই উর্ণনাভের ন্যায় আপনার কর্ম্মজালে আপনি জড়িত হইয়া ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে, ঈশ্বরাদেশ বেদের মাহাত্ম্য ভুলিয়া যায়। এই ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে যে সকল বিধান বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়াও স্মরণ করে না, তাই সংসারে জীবের এত দুর্গতি। ভোজনোপযোগী দ্রব্য সকল ভোজন করিলে শরীরের যেমন পুষ্টি সাধন হয়, অন্তরতর অন্তরাত্মার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, অধ্যাত্মজগতে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানবল, ধ্যানবল, ধর্ম্মবল আহরণ করিতে হয়। সংসারে বহুআয়াসে যে ধনসঞ্চিত হয়, তাহা ক্ষণ কাল স্থায়ী; তাহাতে কোন কালে কাহারও তৃপ্তি হয় নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে রাজচক্রবর্ত্তীর প্রাসাদ পরিদর্শন কর, দেখিতে পাইবে, অল্প বিস্তর সকল স্থানেই ধন সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু কোথাও তৃপ্তির সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে না। কোথাও আনন্দের কোলাহলের মধ্যে যদিও ক্ষণ স্থায়ী সুখের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু জরা ও রোগ শোকের শিখর ভূমি সেখানে এত প্রশস্ত যে, প্রকৃত সুখ কোথায় বিরাজমান রহিয়াছে

তাহা অনুভব করাও যায় না। তথাপি মোহ নিগড়ে আবদ্ধ মন তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারে না, সংসারে সুখ দুঃখকে সমান ভাবিতে পারে না, কে আপন, কে পর, চিনিতে পারে না, তাই দুঃখ দুর্দ্দিনে চিরদিন কষ্ট পাইতেছে।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥

৮ম অঃ, ২৭শ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থসংবাদ গীতায় কহিয়াছেন, মোক্ষ ও সংসার প্রাপক এই দুইটী মার্গ জ্ঞাত হইলে কোন যোগী মোহ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সুখ-বুদ্ধি বশতঃ স্বর্গাদি ফল কামনা করেন না, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও। জীবের ভ্রান্তি এই যে, সে সংসারে মোক্ষ প্রাপ্তির আশা করে, ধ্যান, ধারণাদি ধর্ম্মের লক্ষণ সকল সংসারে আয়ত্ত ভাবিয়া চির জীবন সংসারে এক ভাবেই অতিবাহিত করে। কিন্তু প্রকৃতিদেবী চক্ষু খুলিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাকে দেখাইতেছেন যে, ইহা কখনই সত্য নহে। বাল্যকালের ক্রীড়ন যে এত আনন্দজনক, যৌবনের প্রারম্ভে তাহাতে আর রুচি থাকে না; এক সময় সে যে ধূলিধূসরিত থাকিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিত, বনফলফুলে কৃত্রিম গৃহ সাজাইত, এখন তাহাতে আর সে আনন্দ পায় না। সে এখন শিক্ষা-মন্দিরে জ্ঞান-সূর্য্যের প্রভা দেখিতে ব্যস্ত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় নিচয় এক একটী করিয়া যেমন উন্মেষিত হইতেছে, তেমনি প্রবৃত্তি স্রোত উচ্চ হইতে উচ্চাসনে আসীন হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তত শিক্ষা

পরিত্যাগ করিয়া সে সংসারে কর্ম্ম-স্রোতে গা ঢালিয়া দিল, কোথায় উত্তীর্ণ হইবে জানে না, কোন্ কর্ম্মের কি ফল প্রাপ্ত হইবে ভাবে না, অনবরত কেবল কর্ম্মের প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে। আজি ধন সঞ্চয় হইল, কাল স্ত্রী পুত্র পরিবার সংযুক্ত হইয়া সংসারী হইল, পরশ্ব সে পিতা, পিতামহ নামে অভিহিত হইয়া সংসারক্ষেত্রে মান্য গণ্য হইয়া, কত যশ, কত খ্যাতি লাভ করিল। ভাগ্যক্রমে হয়ত সে দেশাধিপতি হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত উপাধি পাইল, ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ হইল, যশ-সৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া সংসার সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ম্মম কাল তাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া যে ভাবে বাল্য হইতে কৈশরে, এবং যৌবন হইতে সংসারে আনিয়াছিল, সেই ভাবে ক্রমে তাহাকে জরাগ্রস্ত করিল। সে এখন আর দূরস্থ বস্তু ভাল দেখিতে পায় না, দূর পথে ভ্রমণ করিতে পারে না, সুখাদ্য বস্তু সেরূপে আর চর্ব্বণ করিতে পারে না, সে কৃষ্ণ কেশ শুভ্র বর্ণে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, মধুর সঙ্গীত সে ভাবে আর শুনিতে পায় না, শরীর ভগ্ন দশায় উপস্থিত হইয়াছে, প্রেমবিলাসিনীর প্রেমোদ্যানে আর সে সৌন্দর্য্য দেখে না, মান সম্ভ্রমের পতাকা যদিও প্রাসাদোপরি সমভাবে উড্ডীন্ রহিয়াছে, কিন্তু, ঘরে বাহিরে কোথাও আর তাহার সুখ দৃষ্ট হয় না। সে যেন সংসার ছাড়িয়া আর কোন দেশে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে, কোথায় যাইবে জানে না, পথের সম্বল কি লইবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে না, দিন দিন যত ক্ষীণ কলেবর হইয়া আসি-

তেছে, ততই তাহার চিন্তা বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু উপায় কিছু দেখিতে পাইতেছে না, কাল অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে যে মহাকালের সদনে আহ্বান করিতেছে,—বুঝিয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। এত আশা উদ্যমে যে সংসার ক্ষেত্র বিস্তারিত করিলাম, তাহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব, জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয়তম পুত্র-পরিবারগণকে যে এত যত্নে লালন পালন করিলাম, তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে, কে আমার ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহালিঙ্গন দিয়া সুখী করিবে, এই ভাবিয়া যত বিশীর্ণ হইতে লাগিল, কাল তত নিকটস্থ হইয়া কবলিত করিল। ভাবুক পাঠকগণ এখন ঐ মৃতকল্প জীবের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে উহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট দেশে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, কর্ম্মফল তাহাকে আপন আপন পথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র রহিয়াছে। জীব! তুমি কোথায় যাও, আবার শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত লোক হইতে লোকান্তরে অবস্থিতি করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তখন তাহাতে তৃপ্তি কোথায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকে চৈতন্য দান করিবার নিমিত্ত গীতায় এইরূপ কহিয়াছেন।—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥

৮ম অঃ ২৮শ।

অধ্যয়নাদি দ্বারা বেদ সকলে, অনুষ্ঠানাদি দ্বারা যজ্ঞ সকলে,

কায়-শোষণাদি দ্বারা তপস্যা সকলে, সৎ-পাত্রে অর্পণাদি দ্বারা দানে, যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, আমার কথিত এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ট যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, এবং জগতের মূলীভূত উৎকৃষ্ট স্থান কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হন। এখন স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সংসারে থাকিয়া জীব মোক্ষপদ লাভে অধিকারী হইতে পারে না। রাজর্ষি জনক সংসারে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় সংসার ধর্ম্ম তাঁহাকে মোক্ষ পথের পথিক করিতে পারে নাই, তাই তিনি জানকীকে রাম সদনে প্রেরণ করিয়া অমর পথের যাত্রী হন। এখন স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ ইহা পূর্ব্বেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শাস্ত্রে আশ্রম-চতুষ্টয়ের কার্য্য এত বিস্তৃত রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সংসারে মানুষ যখন প্রতিপালিত হয়, তখন তাহার বাল্যাশ্রম,—অনায়াসলব্ধ প্রয়োজনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ে প্রতি-পালিত হয়। যৌবন তাহার শিক্ষাশ্রম, সে তখন শিক্ষাসমি-তিতে উপনীত থাকিয়া জ্ঞান লাভ করে ও কর্ম্মঠ হয়। তাহার পর গৃহাশ্রম,—এই আশ্রমে সে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পুণ্য সঞ্চয় করে। তাহার পর বানপ্রস্থাশ্রম,—এই আশ্রমে সংসারের প্রবৃত্তি নিচয় বৈরাগ্যে আহুতি প্রদান করিয়া বন গমন বা তীর্থ পর্য্যটন করে। তীর্থে কেবল দেব দর্শন হয় না, এই সকল মহাত্মাদিগের সমাগমে তীর্থ স্বর্গোপম হইয়া উঠে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় কশ্যপপুরে (কাশ্মীরে)

বরাহ মূল হইতে অমর নাথের অমরধাম পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মুনি ঋষিদিগের এত আশ্রম। সেই সকল আশ্রম স্থানের শোভা দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। রাজর্ষি জনক, মুনি-পুঙ্গব ভৃগু, ভরদ্বাজ, গৌতম দত্তাত্রয়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বহুকাল অমরধামে গমন করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহা-দিগের তপস্যা স্থান জীবন্ত ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই আশ্রম চতুষ্টয় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সন্ন্যাস আশ্রমে উপনীত হওয়া যায়,—সেখানে জীব ব্রহ্মের একতায় সামঞ্জস্য হইয়াছে। এই আশ্রম হইতে মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ হইয়া থাকে। অমরাবতী গঙ্গার ধার ধরিয়া যে পথে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, সে পথে যাইতে হইলে এই পথ অবলম্বন করিয়া এই আশ্রমের পর (সন্ন্যাস আশ্রমের পর) সশরীরে নিরাপদে স্বর্গারোহণ করা যায়। শুক মুখে এই বাক্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া মহাত্মা দত্তাত্রয়স্বামী যোগানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া চির শান্তি ধামে উপনীত হইতে সমর্থ হইলেন।

যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া অমরধামে যাত্রা করেন, তাঁহারা অমরনাথ দর্শনের পর এই অমর কথা শ্রবণ করিয়া অম-রত্বলাভ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা।

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পণ্ডিত কহ্লন ভট্ট কহিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতীয় অবশিষ্ট রাজগণ আত্মীয় স্বজন বিহীন হইয়া শোক সাগরে ভাসিতে ভাসিতে

কাশ্মীরে যাইয়া অবস্থিতি করেন। সেই অবধি বহুকাল হইতে কাশ্মীরে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কাশ্মীর হিন্দুস্থান হইতে বহুদূর হওয়ায় হিন্দুস্থানের সম্রাটগণ তাঁহাদিগের কার্য্যনিচয় যথারীতি পরিদর্শন করিতে পারিতেন না। মোগল সম্রাটদিগের সময় দাক্ষিণাত্যের ও বঙ্গদেশের নবাবেরা যেমন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, কাশ্মীরের রাজগণও সেইরূপ স্বাধীন ভাবে সমস্ত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। বঙ্গদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ সর্ব্বদা বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিতেন, কালক্রমে কাশ্মীরের রাজগণও ভারত-যুদ্ধের কারণ সকল ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধ বিদ্রোহেই কালাতিপাত করিতেন। সুতরাং বহুকাল শান্তির আশা কোথাও দৃষ্ট হইতেছিল না। বঙ্গে যৎকালে মহারাজ আদি-সুর বাজপেয় যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন বৈদিকাচার এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সে জন্য বেদবিদ্ পণ্ডিত প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। সুতরাং কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদবিদ্ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং বাহুল্যরূপে বেদপাঠের উপায় উদ্ভাবন করেন। কালে সেই সকল পণ্ডিতগণের সন্ততিরা (কি কারণে জানি না) বৈদিকাচার পরিত্যাগ করিয়া পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনার আয়োজন করেন। তাহার পরিণাম কিরূপ উপস্থিত হইয়াছে, ভাবুক পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কাশ্মীরের দুর্দ্দশাও ঐ রূপে পরিণত হইল, রাজন্যবর্গ দিবা রাত্রি সংগ্রাম স্থলে থাকিতেন; তাঁহাদিগের প্রীতি প্রণোদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ তান্ত্রিকাচার প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সুতরাং

দেখিতে পাওয়া যায়, এক কালে প্রশান্ত মহাসাগরের কূল হইতে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত, ভারত সাগরের উপকূল হইতে হিমাচলের উপত্যকা পর্য্যন্ত, এক প্রবাহে তন্ত্র শাস্ত্রের ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে শিব চিরদিন শান্তির আধার বলিয়া জগতে পরিকীর্ত্তিত হইতেছিলেন, তাঁহার অঙ্কে মহা-কালীর মহামূর্ত্তি সাজাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ভৈরব ভৈরবী নামে অভিহিত করিলেন। যে শিব কেবল মাত্র বিভূতি বিল্বদলে পরিতুষ্ট থাকিতেন, এখন তাঁহার ঘরে জীবনী শক্তি রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে শিবের চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী শোভা পাইতেন, এখন তাঁহার চতুঃপার্শ্বে ডাকিনী, যোগিনী, ভূত, প্রেতিনী, কিলকিলা রবে কিলকিল করিতে লাগিল। সুতরাং শান্তির আকাশে যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, অশান্তির অশনি অজস্র ধারে পতিত হইতে লাগিল। সুখনিদ্রায় ভারত এতদিন সুষুপ্তির সুখ অনুভব করিতেছিল। এখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কুম্ভকর্ণের ন্যায় অকালে ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভাবুক! ভাব দেখি কি দেখিতেছ। যদি চক্ষে এখনও নিদ্রার বেগ থাকে, তবে ভাল করিয়া না দেখিতে পার, আইস আমি দেখাইয়া দিতেছি, ঐ দেখ উভয় দলের অক্ষৌহিনীসেনা কুরুক্ষেত্রে মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, শকুনি বিকটাকার রব করিয়া তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার চক্ষু কাহার মস্তক, চঞ্চুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কলকল রব করিতে করিতে টানিতেছে; ও বদন বিস্তার করিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। অধিনেতাগণের আত্মীয় স্বজন যাহারা অবশিষ্ট

জীবিত আছে, তাহারা হা হতোস্মি রবে চীৎকার করিয়া নিকটে রোদন করিতেছে, অন্য দিকে দাম্ভিকরাজ দুর্য্যোধন শত ভ্রাতায় ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া মৃত শয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণিগণ, শোকাশ্রুপূর্ণ-নেত্রা দেবী গান্ধারির অনুগমন করিয়া কাতর রবে চীৎকার করিতে করিতে ভর্ত্তাগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতেছেন, অন্য দিকে মহাবীর ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা তাঁহার পদ-প্রান্তে দণ্ডায়মান আছেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, ঋষিগণ, ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর এবং অন্যান্য জীবিত আত্মীয়গণ তাঁহার শরশয্যার চতুঃপার্শ্বে বিষণ্ণ মনে দণ্ডায়মান আছেন,—কেবল ঘোরচক্রী মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন, কে বলিতে পারে! সকলেই শোক-সাগরে ভাসিতেছেন, সুতরাং কাহারও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নাই। কেবল সেই শরশয্যায় শয়িত বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ বুঝিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখন স্তিমিত নয়নে, কখনও তাহা উন্মোচন করিয়া মধুসূদনের অপার চিন্তার পারে না যাইতে পারিয়া স্তম্ভিত হইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, এ ঘোর চক্রীর চক্রান্তের ভাব কে বুঝিবে, কে এ অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিতে পারিবে। আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, হে দীনবন্ধো! বল দেখি এ রহস্যের উদ্ভেদ কে করিবে? অন্তর্যামী ভগবান ক্ষত্র-কুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের মনের ভাব অবগত হইয়া হাস্য করিলেন,

এবং প্রায়োন্মুখ ভীষ্মের মুখের দিকে তাকাইয়া, কহিলেন, বীর! তুমি ত বুঝিয়াছ, তবে আর জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ঐ দেখ ভারতলক্ষ্মী বিষণ্ণ মনে বিমানপথে গমন করিতেছেন। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সহচরীগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে, তুমিও তাই উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়া দেশের শেষাবস্থা দেখিয়া যাইতে চাহিতেছ। আমিও আর অধিক দিন এখানে থাকিতে পারিতেছি না। এখন ভীষণ-রূপ ভৈরব ভৈরবী নিজ নিজ সহচর সহচরী সঙ্গে লইয়া ভারতের অস্থি মজ্জা চর্ব্বণ করিবেন, ভূত-প্রেতে রাজ্য পরিপূর্ণ হইবে, তাহাদের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার স্থানে সুরাদেবী আবির্ভূত হইবেন, ফল-মূলাশী ঋষিদিগের স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি প্রাণিঘাতক পশুদের সমাগমে জনস্থল অরণ্যে পরিপূর্ণ হইবে, আর তাহাদের সেবকগণ সুগন্ধ পুষ্পমালা পরিত্যাগ করিয়া হাড়মালা দেবতার গলে অর্পণ করিবে। তাই দেখ, ঐ ভূতভাবন ভবানীপতি শিব, শিবোচিত শান্তিবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভৈরব সাজিয়া ভূত পিশাচের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে ভারতে আগমন করিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কালী করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে হাসিতে যেন জগতকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছেন। কাহার সাধ্য উঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়! তুমি যাও, আমিও যাইতেছি,—অচিরকাল মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মহাপ্রস্থান করিবেন, বাকি আর কি থাকিল? সমস্ত ভারত শ্মশানে পরিণত হইল। এই শ্মশানে বেদোক্ত যজ্ঞে আর কি হইবে? যজ্ঞের হোতা ঋষিগণ মহা

প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্য জাতি ভারতে আর বর্ত্তমান রহিল না। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভারতের সমরানলে চিতাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল, তাই ঐ দেখ, ভৈরবগণ হি হি রবে হাস্য করিতেছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদের প্রাণধন হরি যদুকুল ধ্বংস করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে পর, ভারতের আরাধ্য দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। একথা দুই চারি দিন কিংবা দুই দশ বৎসরের নহে, প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইল ভারতের সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, আমরা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছি, তাই কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সকলি অন্ধকার দেখিয়া মোহান্ধকারে নিপতিত রহিয়াছি, কেহ কাহাকে দেখিবার আশাও রাখি না। তাই এক একবার মাথা তুলিয়া দেখি, অন্ধকার দেখিয়া আবার নিদ্রায় অভিভূত হই। প্রায় ২৫০০ বৎসর অতীত হইল একবার একটী যুবরাজ জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, ভাবিয়াওছিলেন, ভাবনার কার্য্য করিতে গিয়া প্রাণ, মন, ধন তাহাতে বিসর্জ্জনও দিয়াছিলেন, কিন্তু কৈ? কি করিতে পারিলেন? একমাত্র বেদের উপর নির্ভর না করিতে পারিয়াই জল-বুদ্বুদের ন্যায় এ মোহ-সাগরে যেমন উঠিলেন, তেমনই বিলীন হইয়া গেলেন। তাঁহার সময়ে কতবার পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাভা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কৈ! সে সুখ-সূর্য্য ত উদিত হইল না? আমরা ত জাগিলাম না? তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ ভারতে একদিন একছত্রী হইয়াছিলেন; এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদিগের

শত শত কীর্ত্তি কাশ্মীর প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কৈ! তাঁহাদের যে আর নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর প্রায় এক সহস্র বৎসর অতীত হইল, এক নবীন যোগী শিবাবতার বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবল এবং বিদ্যার প্রভাবে ভারত চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভারতাকাশে সে সুখ-সূর্য্য উদিত হইল কৈ? তাহার পর ৩৫০ বৎসর হইতে দুই চারি জন ভক্ত জগতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মের শ্রেষ্টতা প্রতিপাদন করিয়া যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি হইল? তাঁহাদের ক্রন্দনে আবাল বৃদ্ধ জাগিল, জাগাইল কাঁদিল, কাঁদাইল। তবে আবার ঘুমাইয়া পড়িল কেন? একি সেই কুরুক্ষেত্রের ক্রন্দনের রোল? না, ভৈরব ভৈরবী, ডাকিনী যোগিনীর কোলাহল? না, মোহ নিদ্রায় দুশ্চিন্তার কুস্বপ্ন? আবার আজি কালি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অনেকে মা, মা, বাবা, বাবা বলিয়া ঘরে বাহিরে চীৎকার করিতেছে, আর ভাবিতেছে; ইহাতেই বুঝি ধ্রুব-প্রহ্লাদের স্বাভাবিক ভক্তি পাওয়া যাইবে, তাহা কি হইতে পারে? না, না, ওরূপে ভারত জাগিবে না, ও ক্রন্দন কুরুক্ষেত্রের ক্রন্দনের রোলে মিশাইয়া যাইতেছে। স্থির হও চিন্তা কর, বুঝিতে পারিবে ওপ্রকারে ভারত জাগিবে না। মহর্ষি মনুর আদেশ পালন কর, সনাতন বেদের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন কর, পুনরায় বর্ণাশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করিতে যত্ন কর, আশ্রম চতুষ্টয় স্থাপন কর, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে। তাহার পর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলে মহাদেব প্রসন্ন

হইয়া ভৈরব ভৈরবী বেশ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস হইতে বৃষবাহনে শিব-দুর্গা রূপে আবার ধীরে ধীরে ভারতে আগমন করিবেন। তখন দেখিতে পাইবে, আমাদের গৃহ-বিবাদের কণ্টক, ভুজঙ্গ স্বরূপ হিংসা, দ্বেষ নতমস্তক হইয়া তাঁহার অঙ্গে বিলীন হইবে, দেশব্যাপ্ত কলঙ্ককালিমা তাঁহার কণ্ঠে নীল বর্ণ মেঘ রূপে পরিণত হইয়া শোভা পাইবে, পাপরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল নিরীহ বৃষ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার বাহন হইবে, আর যত সংসারের দুঃখ-দুর্ব্বিপাক আছে, তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টিতে তাহা ভস্মীভূত হইবে। তখন আবার ভগবতী ভাগীরথী মধুক্ষরণ করিবেন, দুর্ব্বিবহ বিষাদরাশি মলয়ানিলে পরিণত হইয়া মন্দ মন্দ বহিতে থাকিবে, ঘোর অরণ্য সকল মধুকানন হইয়া তপস্যা স্থানের উপযোগী হইবে। গিরিকন্দর সাধু সমাগমে পূর্ণ হইবে, গৃহস্থগণ শান্তির আশ্রমে অধিবাস করিবে, সময়ে সময়োচিত গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মনুষ্য-গণ ব্রহ্মচর্য্য, দণ্ড, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থ আশ্রমের কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন করিয়া সংসার-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা,—সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মহাপ্রস্থান করিবে।

অমরকথা প্রসঙ্গ করিয়া আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, পাঠকের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কারণ তাঁহাদিগের অন্তরে স্বতঃ এই ভাব উদিত হইবে যে, অমরনাথ-লেখক আমাদিগকে মহাপ্রস্থানে টানিয়া আনিতে চাহিতেছেন। সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, অবসর ক্রমে কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি নিকটস্থ তীর্থ দর্শন করিতেছি, দুই বেলা সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছি, আর অবস্থাক্রমে

ব্রতাদি যাগ, যজ্ঞ সমাধা করিতেছি, সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইয়া মধুর হরিনাম-সুধা পান করিতেছি, তবে আবার এ উপদ্রব কেন? পাঠক! ভয় পাইও না। আমি তোমাদের নিকট নূতন কিছুই বলিতেছি না, আজি কালিকার মত কোন নূতন আবিষ্কৃত পথেও আহ্বান করিতেছি না। এ পথের সকলেই পথিক, ইচ্ছা করুন, বা না করুন, একদিন অবশ্যই সে পথে যাইতে হইবে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। মহাপ্রস্থান করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ঐ যে বত্রিশ হাত নাড়ী গলায় জড়াইয়া শোণিত-পোষ্য সন্তান, জননী-গর্ভে বর্দ্ধিত হইতেছে, সেখানে সূর্য্যালোক যায় না বলিয়া সে অন্ধ; আকাশ-শূন্য দেশ বলিয়া সে মূক, দিক-শূন্য বলিয়া সে চলচ্ছক্তিহীন, তথাপি সে করজোড়ে মস্তক অবনত করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার জন্য (ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য) প্রকৃতি দেবীর চরণে প্রার্থনা করিতেছে, অত বন্ধন হইতে তাই মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ যে স্তন্যপায়ী অসহায় শিশু মাতৃ ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতেছে, গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিয়া জননীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, উহার গতির বেগ নিরীক্ষণ কর। বালক ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, মাতা তাহাতে বাধা দিয়া, ক্রোড়ে টানিয়া মুখ চুম্বন করিয়া কহিতেছেন, প্রাণধন! আর বাহিরে যাইও না, বালক মধুর অস্পষ্ট ভাষে কহিতেছে, না—না—না। মাতা বুঝিলেন বৎস আর বাহিরে যাইবে না। সুকুমার বালক প্রকৃতির প্রভাবে বুঝিল,—না যাইব ত থাকিব কোথায়? কারণ, সে এদেশে থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথাও দেখিতেছে না। এইরূপে ভব-চক্রের স্নেহ-

নিগড়ে যত দৌড় ঝাঁপ করিতে লাগিল, তত মহা প্রস্থানে অগ্রসর হইতে চলিল, (বাড়িতে লাগিল)। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে সে যৌবন সীমায় উপনীত হইল, পিতা মাতা শুভক্ষণে উপনয়ন দিয়া শিক্ষা-সমিতিতে প্রেরণ করিলেন, সেখানে সে জ্ঞান, ধন ও ধর্ম্মে বলীয়ান হইয়া রুচি অনুসারে সংসার ধর্ম্মের অনুযাত্রী হইল। এখানে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যত অগ্রসর হইতে লাগিল, তত মায়া মোহে জড়িত সংসার শৃঙ্খল তাহাকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া বন্ধন করিতে লাগিল, আত্মীয় স্বজন ভাবিল, আর কোথায় যায়। কিন্তু সে তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইল। পাঠক! দেখ, দেখ, ইহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে কৃষ্ণ কেশ শুভ্রবর্ণে পরিণত হইয়াছে, সে উজ্জ্বল চক্ষু দীপ্তিহীন হইয়া আসিয়াছে, সে রজত বর্ণ দন্ত-পাঁতি স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কথার জড়তা জন্মিয়াছে, সে কমনীয় কান্তি নিষ্প্রভ হইয়া মলিনতায় পরিণত হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কেমন শিথিল হইয়া আসিয়াছে, আর যষ্টি সহায় ব্যতীত পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতপদে গমন করিতে সমর্থ হইতেছে না, তথাপি তাহার গতিরোধ কে করে? গর্ভস্থ অবস্থায় যেরূপ বেগে সে মহাপ্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এখনও সে বেগের সমতা হ্রয় নাই। ক্রমে সতেজ ইন্দ্রিয়নিচয় নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া, ঐ দেখ প্রাণ-পক্ষী বায়ুবেগে মহাপ্রস্থান করিতেছে। অতএব ইহাতে সহজেই অনুমিত হইবে, মহাপ্রস্থান করিবার জন্য সকলেই উদ্যত। তখন এমন গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত

না হওয়া কি বিড়ম্বনা! সেই জন্য বলিতেছি, যখন মহাপ্রস্থানই সকলের একমাত্র গতি, তখন সনাতন বেদবিহিত অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত থাকিয়া কেন না সংসারকে সুখধাম করিয়া তুলি? শরীরস্থ থাকিতে আত্মার হিত চিন্তা করি! কি উপায়ে এ কার্য্য সহজে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা প্রাচীন আচার্য্যেরা শত শত গ্রন্থে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

এ কূট প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন, ব্যঙ্গও করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা এত "আর্য্য," "আর্য্য" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন কেন? প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তি বজ্রধ্বনিতে বর্ণন করিতে গিয়া প্রাচীন আর্য্য-সমাজের এত গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন কেন? "জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,গাও ভারতের জয়" বলিয়া গগনভেদী নাদে গান ধরিয়াছেন কেন? ইহার যে প্রত্যেক শিরায় শিরায়, বর্ণে বর্ণে ভারতের বর্ণমালা (জাতি নির্ব্বাচন) গ্রথিত রহিয়াছে। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম উপাসনায় নিযুক্ত না হইবেন, যতক্ষণ ক্ষত্রিয়বল রাজ্য রক্ষণে সমর্থ না হইবে, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত না হইবে, যতক্ষণ শূদ্র দ্বিজবর্ণের সেবায় অনুরক্ত না হইবে, ততক্ষণ আর্য্য জাতি কোথা হইতে নির্ব্বাচন করিবে? তাহার পর যতক্ষণ তাহারা আশ্রম ধর্ম্মের, (ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, দণ্ড ও বানপ্রস্থ আশ্রমের) মর্য্যাদা রক্ষা না করিবে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহারা পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তীর্থ যাত্রা।

ভারতবর্ষে যত তীর্থ আছে, অমরনাথ তাহাঁর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। কেবল দুরতানিবন্ধন নহে,—তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্বর্গোপম বলিয়া জগতে বিখ্যাত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন লোকে গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শনার্থ উদ্যোগ করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে এক প্রকার সংসারের আশা পরিত্যাগ করিতে হইত। স্মরণ হইতেছে প্রায় ৪০ বৎসর গত হইল, আমাদের কয়েক জন আত্মীয় কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা বাগবাজারের ঘাটে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নৌকারোহণ করেন, তৎকালে আমরা কূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদিগের যাত্রা দেখিতেছিলাম। যখন তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, তখনকার ক্রন্দনের রোল স্মরণ হইলে এখনও হৃদয় কাম্পিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের তৎকালের ভাব দেখিয়া আমরা অনুমান করিতেছিলাম, তাঁহারা যেন চিরজীবনের মত আত্মীয় স্বজনের সহিত জন্ম-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। কারণ আর কিছুই নহে, কেবল পথের দুরতা ও দুর্গমতা। এই দূর পথ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত কত আয়োজন, চোর ও দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে, আত্মরক্ষার উপযোগী শড়্‌কি, বল্লম, বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করা হই-

ষাছে। তাঁহাদিগের এই প্রকার উদ্যোগ দেখিয়া দেশের অনেক লোক নৌকা সাজাইয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা যাত্রা করিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন ধন-রত্ন সমন্বিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম জলে ভাসিয়া যাই-তেছে,—দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আমাদের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেলেন। তাহার ৬ কি ৮ মাসের পর যখন তাঁহারা দেশে পুনরাগমন করিলেন, তখন সে দূর পথের এক এক দিনকার সঙ্কটের কথা শুনিলে হৃৎকম্প হইয়া উঠে;—কখন নৌকার তলা ফাটিয়া জল উঠিতেছে দেখিয়া ভীত চিত্তে নৌকা পরিবর্ত্তন করিতেছেন, কখন ঝড় বৃষ্টির প্রভাবে প্রকম্পিত হইয়া নৌকা ডোবে ডোবে দেখিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, কখন প্রয়োজনীয় খাদ্য জিনিসের জন্য তীর ছাড়িয়া দূরস্থ গ্রামে ভ্রমণ করিতে-ছেন, কখন দস্যুভয়ে ভীত হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতেছেন, অথচ এই দুর্ঘটনা কাহাকেও জানাইবার উপায় নাই। তখন ডাকের বন্দোবস্ত ভাল ছিল না, আট আনা মাশুলে এক খানি পত্র বহু দিনে দেশে পৌঁছিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তখন ইংরাজি ভাষা জানিতেন না, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল না, সুতরাং পত্র লিখিয়া খামে ঠিকানা লিখিবার সময় মহা অসুবিধা হইত, আবার সকল স্থানে ডাক ঘরও ছিল না। এইরূপ নানা কারণে কেহ কাহাকে পত্র লিখি-তেন না, সুতরাং যত দিন বিদেশে থাকিতেন, কেহ কাহারও সংবাদ লইতে পারিতেন না। সে কালে আত্মীয় স্বজন এইরূপে তীর্থ যাত্রা করিলে, যত দিন তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া না আসিতেন, তত দিন তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ক্ষৌর কার্য্য করিতেন না।

সুতরাং ঘরে বাহিরে এক অভাবনীয় অমঙ্গলের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। এখন তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বাষ্পীয় শকট দ্রুতগমনে দুই মাসের পথ দুই দিনে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, আর সেইরূপ ভয়ের কারণ কোথাও নাই, একটী ক্ষুদ্র ব্যাগে দুই শুট পরিধেয় ও প্রয়োজনীয় সামান্য শয্যা লইয়া, এবং প্রয়োজনীয় যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে নিকটস্থ বহুতর তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসা যায়,—আজি কালি প্রয়োজন হইলে ৪০ ঘণ্টায় কাশী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসা যায়। সুতরাং জনসাধারণ আজি কালি অনায়াসে অতি অল্প দিনের মধ্যে গয়া হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, দূরস্থ দ্বারকা, রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ স্থান রেল পথের ধারে হওয়ায়, তাহাও দর্শন অনেক সুলভ হইয়াছে। কিন্তু অমরনাথের পথ যে দুর্গম সে দুর্গমই রহিয়াছে। সুতরাং যে সে ব্যক্তির সেখানে যাওয়া সহজ কথা নহে। শুনিতেছি কাশ্মীরে রেল হইবার প্রস্তাব হইতেছে। যদি হয় তাহা হইলে অনেক দুর্গম পথ সহজে অতিক্রম করা যাইতে পারিবে, তথাপি অমরনাথ পর্য্যন্ত রেল হওয়া কোন কালেই সম্ভবপর হইবে না। অমরনাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে যাত্রীরা কাশ্মীরে সমাগত হয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন অমরনাথের দর্শন লাভ হইয়া থাকে। জঙ্গলী পথ নিরাপদে অতিক্রম করিবার নিমিত্ত কাশ্মীরের মহারাজ সুব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা এবার সেখানে এ যাত্রায় উপস্থিত ছিলাম। কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইল, তদ্বিবরণ সকলেই জানিতে

যে উৎসুক হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে জন্য এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

গত বৎসরের অর্থাৎ ১৩০১ সালের মাঘ মাসে আমরা এক বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রচার করি। তাহাতে লিখিত ছিল যে, কাশ্মীর ভ্রমণ বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং যদি কেহ আমাদের সহিত যোগদান করেন, তাহা হইলে সাধ্যমত এক যাত্রীমণ্ডলী (Mission camp) প্রস্তুত করি। তাহাতে শীত প্রধান দেশের ভ্রমণোপযোগী প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় সংগৃহীত হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি তাঁবু থাকিবে, পরিচর্য্যার নিমিত্ত কয়েকজন ভৃত্য ও থাকিবে, এবং আরোহণের জন্য প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটী সুসজ্জিত অশ্ব থাকিবে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যাহাতে কাশ্মীরে পৌঁছান যায়, সেই নিয়মে দেশ হইতে যাত্রা করা যাইবে, এবং সমস্ত গ্রীষ্ম কাল কাশ্মীরে এই ভাবে অবস্থিতি করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা সমান ভাবে সকলকে দিতে হইবে। এই ভাবে, ভারতে স্বাধীন আর্য্যমিশন (Indo-Aryan Independent Mission) নাম দিয়া এক বিজ্ঞাপন পুস্তকাকারে প্রায় ৬০০ খণ্ড মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে বিতরণ করা হয়। অনুমান হয়, ৬০০০ লোকের অধিক তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন, দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তিদিগের নিকট, এবং পেন্‌সন্‌-ভোগী অনেক রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকটও প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহার মধ্যে ১৯ খানি মাত্র আবেদন পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আরও দুঃখের বিষয় এই, যথা সময়ে তাঁহাদের

মধ্যে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, আমাদের উদ্যোগ কর্ত্তাদের মধ্যেও অনেকেই অবশেষে পৃষ্ঠদর্শন করাইয়াছিলেন, সুতরাং যাত্রা কালে আমরা তত সুখী হইতে পারি নাই। কিন্তু যখন আমরা শ্রীনগরে উপস্থিত হই, তখন প্রায় ১৪ জন ভদ্রলোক পৃথক্ পৃথক্ ক্যাম্প সাজাইয়া আমাদের অনুগমন করেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া কাশ্মীর ভ্রমণের পথে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের ক্যাম্পে এক জন ডিস্‌ট্রিক্ট জজ্, দুই জন এগ্‌জিকিউটিভ্ ইন্‌জিনিয়ার এক জন ডাক্তার, চারি জন মহাজন, (Bankers) দুই জন কণ্ট্রাক্টর,আর অবশিষ্ট কয়েকজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বহুসংখ্যক তাম্বু, অশ্ব ও ভৃত্য সঙ্গে থাকায় আমাদিগের যাত্রীমণ্ডলী (Standing Camp) দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছিল। ডাকের সুবন্দোবস্ত থাকায় আমরা যে দিন যেখানে থাকিতাম, সে দিন সেখানে সংবাদ পত্রাদি অনতিবিলম্বেই প্রাপ্ত হইতাম। আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রতিদিন দৈনিক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইত, এবং পাঞ্জাব প্রদেশের একখানি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে যথাক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত। তাহা হইতে এস্থলে অনেক সংবাদ গৃহীত হইল।

গত ১৬ মে, (১৮৯৪) ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে আমরা লাহোর পরিত্যাগ করি। পরদিন প্রভাতে রাওলপিণ্ডীতে পৌঁছি, সেখানে রায় বাহাদুর মঙ্গলসেন, আটকমারী রেলের একজামীনার এবং খানপুরের অধীশ্বর রাজা জাহান্ দাদ্ খাঁ, খাঁ বাহাদুর, মিশনের অভ্যর্থনার নিমিত্ত আয়োজন করেন, আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, পাঞ্জাব হইতে আর দুই জন ভদ্রলোক আমাদের সহিত কাশ্মীর যাইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং আমরা সকলে একত্র হইয়া মহা-আহ্লাদে কাশ্মীর যাত্রা করি।

কাশ্মীরের পথ।

পান্থনিবাস	স্থান সমূহের নাম		সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চতা (ফুট)	দূরত্ব (মাইল)	বিশেষ কথা।
	যেখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে।	যেখানে পৌঁছিবে।			
	রেল	পথ			
১	হাবড়া	দিল্লী	,,	৯৬৩	
২	দিল্লী	রাওলপিণ্ডী	,,	৫২৩	
	রাস্তা	পথ			
৩	রাওলপিণ্ডী	বারাকাও	১৮০০	১৩॥	
৪	বারাকাও	ত্রেট্‌	৪০০০	১২	
৫	ত্রেট্‌	মরী	৯০০০	১৪॥	
৬	মরী	কোহালা	২০০০	১৪॥	
৭	কোহালা	দুলাই	২১৮১	১২	
৮	দুলাই	দোমেল	২৩১৯	৯	
৯	দোমেল	গড়ী	২৭৫০	১৩॥	
১০	গড়ী	নেলী	৩০৮০	১২	
১১	নেলী	চাকোঠী	৩৭৮০	৯॥	
১২	চাকোঠী	উড়ী	৪৪২৫	১৩	
১৩	উড়ী	রামপুর	৪৮২৫	১৩	
১৪	রামপুর	বারামূলা	৫১৫০	১৪	
১৫	বারামূলা	পত্তন্	৫৩০০	১২	
১৬	পত্তন্	শ্রীনগর	৫২০০	১৮	
				২৬৬৬॥	

(১) রেল পথ

হাবড়া হইতে দিল্লী ৪ দিন এবং দিল্লী হইতে রাওলপিণ্ডী ৩ দিন, এই সাত দিনে রেল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে, পথে ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প।

(২) রাস্তা পথ

কুচে কুচে গমন করিতে পারিলে বিশেষ কোন রূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। নচেৎ টঙ্গা কিংবা একায় এক দিনে বহুদূরের পথ যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে বিশ্রামের সময় অল্প থাকে।

(৩) রেল ভাড়া ব্যতীত অন্যান্য খরচের বিষয় স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে।

(৪) শ্রীনগর হইতে "ছড়ির" সঙ্গে অমরনাথ যাত্রা করিতে হয়, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

যত দিন হইতে পাঞ্জাবের রেল লাহোর হইতে পেসোয়ার পর্য্যন্ত খুলিয়াছে, তত দিন হইতে কাশ্মীর যাইবার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুগম হইয়া উঠিয়াছে :—

১। লাহোর হইতে উজিরাবাদ ৩½ ঘণ্টায় পৌছান যায়, সেখান হইতে জম্বু পর্য্যন্ত এক শাখা রেল পথ হইয়াছে, তাহাও প্রায় ৩ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া জম্বু পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। সেখান হইতে পার্ব্বতীয় পুরাতন পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীনগর পৌছিতে হয়।

২। লাহোর হইতে গুজ্‌রাট ৪ ঘণ্টার পথ, তথা হইতে ভীম্‌বার প্রায় ২৯ মাইল, এখান হইতে পীর পাঞ্জাল এবং পুঞ্চ পথ ধরিয়া শ্রীনগর যাওয়া যাইতে পারে।

৩। লাহোর হইতে রাওলপিণ্ডী এক রাত্রে পৌছান যায়। তথা হইতে শ্রীনগর যাইতে হইলে, মরী এবং কোহালার পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া বারামূলায় পৌছিতে পারিলে তথা হইতে নৌকাপথে শ্রীনগরে সহজে উপনীত হওয়া যায়।

৪। রাওলপিণ্ডী হইতে হাসান আবদাল ৩ ঘণ্টার পথ, সে পথ হইতে কাশ্মীর যাইতে হইলে আব্‌টাবাদ হইয়া যাইতে হয়।

এই চারিটী পথের মধ্যে তৃতীয় পথটি অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ হইয়াছে। রাওলপিণ্ডী হইতে মরী হইয়া বৃটিশ রাজ্যের শেষ সীমা কোহালা পর্য্যন্ত আমাদের গবর্ণমেণ্ট এক সুপ্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তথা হইতে কাশ্মীরের মহারাজা নিজ অধিকারে এক সুন্দর পথ শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পথে রাওলপিণ্ডী হইতে বারামূলা পর্য্যন্ত

দিবারাত্র টঙ্গা (এক প্রকার ২ চাকার ঘোড়ায় টানা গাড়ী) চলিতেছে। ডাকও এই পথ দিয়া চলিয়া থাকে। যে দিন হইতে কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম সীমা গিলঘিটে বৃটিশ সেনানিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই পথে লোকের গতায়াত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পথিকের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় স্থানে স্থানে সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য আমরা এই পথ অবলম্বন করিয়া কুচে কুচে কাশ্মীর যাত্রা করি। রাওলপিণ্ডী হইতে মরী ৪০ মাইল; মরী হইতে কোহালা ২০ মাইল; কোহালা হইতে গড়ী ৩৪½ মাইল; গড়ী হইতে হাতীয়ান ৪২½ মাইল; হাতীয়ান হইতে বারামূলা ৬০½ মাইল; এই ১৯৭½ মাইল পথ কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে পারিলে টঙ্গা[১] ব্যতীত ঘোড়া[২], একা[৩], বহিলী[৪], ডুলি[৫], প্রভৃতি সকল প্রকার সওয়ারী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাড়া রাওলপিণ্ডী হইতে (১) ৩৫ টাকা অথবা সমস্ত গাড়ী ১০০ টাকা, ইহাতে ৩ জন বসিতে পারে এবং প্রচুর জিনিস পত্র লওয়া যাইতে পারে, (২) প্রতিকুচে ১ টাকা, (৩) ১৮॥০ টাকা, (৪) ॥০ হইতে ৸০ আনা, (৫) প্রতিকুচে ।১০ মাত্র কাহার, ৬ হইতে ৮ জন লওয়া যাইতে পারে। বারামূলা হইতে শ্রীনগর নৌকা পথে সহজে দুই তিন দিবসে পৌঁছান যায়—ভাড়া ২॥০ হইতে ৫৲ টাকা। শ্রীনগরে থাকিবার স্থান সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং নৌকাতেই বাস করা সহজ ও সুবিধাজনক—ভাড়া প্রতি মাসে ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা। আমরা লাহোর হইতে গমন কালে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট হইতে এবং অন্যান্য মাননীয়

বন্ধুদিগের নিকট হইতে মহারাজার কতিপয় কর্ম্মচারী এবং রেসিডেণ্টে সাহেবের নামে সুপারিস পত্র লইয়াছিলাম। সুতরাং তথায় আমাদের বাসের কোন রূপ অসুবিধা হয় নাই। শ্রীনগরে পৌছিয়া আমরা মহারাজার কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাদিগের অনুকম্পায় তথাকার দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ নানা স্থান ভ্রমণ করি। তদ্বিবরণ এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীনগর।

প্রায় ১৫০০ শত বৎসর অতীত হইল, রাজা প্রবর সেন এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ইহা কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যভাগে স্থিত, বিতস্তা নদীর উভয় তটে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ১২০০০০, তন্মধ্যে হিন্দু ।/০, মুসলমান ॥৵০, অবশিষ্ট অপরাপর জাতি। বিতস্তা নদী শ্রীএগরের মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত। নদীকূল সহরের দৈর্ঘ্য প্রায় ২½ মাইল, প্রস্থে প্রায় ১½ মাইল। গ্রীষ্মকালে নদীর জল নিতান্ত ঘোলা এবং কদর্য্য হয়। সেজন্য ভদ্রলোকেরা চশমাসাহী হইতে পানীয় জল আনাইয়া থাকেন, কিন্তু দরিদ্র লোকে এই জল স্নানে ও পানে ব্যবহার করিয়া নানা রকমে পীড়িত হইয়া পড়ে। শীতকালে ইহার জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু তখন সেই শীতল জল কে ব্যবহার করিবে? স্নানে ও পানে প্রায় সকলেই গরম জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং বিতস্তার জল সর্ব্ব সময়েই অব্যবহার্য্য। ইহার প্রস্থ প্রায় ১৭৫ হস্ত, গভীরতা গড়ে প্রায় ১২।১৩ হস্তের অধিক নহে। সহরটী নদী

দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় কূলে গমনাগমনের জন্য ৭টী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু নদীর উভয় পার্শ্বে কয়েকটী সুবৃহৎ খাল আছে, তাহার দ্বারা অতিরিক্ত জল স্থানান্তরিত হইয়া দূরস্থ হ্রদে পতিত হইতেছে। নৌকাপথই এখানে প্রশস্ত—নদীর স্রোত জল বৃষ্টির সঙ্গে সময়ে সময়ে খরতর হইয়া উঠে। তখন উজান চলা বিশেষ কষ্টকর, নাবিকেরা সে সময়ে গুণ টানিয়া যায়। কোন প্রকার হিংস্র জলজন্তুর এখানে ভয় নাই বলিয়া নৌকায় বাস বড় আনন্দকর। এই জন্য অধিকাংশ লোকে—কি দরিদ্র, কি ধনী, সকলেই প্রায় নৌকায় বাস ও জলপথে ভ্রমণ প্রশস্ত বলিয়া মনে করে। আমাদের গতায়াত প্রায় নৌকাপথেই সম্পন্ন হইত,তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম। উভয় কূলে দ্বিতল ত্রিতল বাটী সকল যেমন রমণীয়, তাহার অন্যদিকে আকাশস্পর্শী সফেদা বৃক্ষ সকল তেমনি সসজ্জ সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকায় এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে। তাহার পর নানা জাতীয় সৌগন্ধময় পুষ্প বৃক্ষের শাখায় বসিয়া,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীসকল যখন নৃত্য করিতে করিতে মধুর রবে গান ধরে,তখন ভ্রমণকারীর যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। নৌকাপথে ভ্রমণ বহু ব্যয়সাধ্য নহে। প্রত্যেক নাবিকের মাসিক বেতন ৪ টাকা এবং নৌকা ভাড়া ১ টাকা মাত্র। চারিজন নাবিক এবং দুইখান নৌকা (বাসের জন্য এক খান বড় এবং বেড়াইবার জন্য এক খান ছোট নৌকা) নিযুক্ত করিলে পরম সুখে জলে বাস করা যাইতে পারে। এখানকার বাটী সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কেবল মহারাজার ও কতিপয় ধনাঢ্য লোকের সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা

আছে, নদীতটে রাজবাটী ও অন্যান্য অট্টালিকা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত বোধ হয় যেন উহারাও নদীর সঙ্গে লগ্ন হইয়া জলোচ্ছ্বাস করিতে করিতে তীরে উঠিতে চাহিতেছে, আর বিতস্তা তাহা দেখিয়া সঙ্গ হারা হইবে ভাবিয়া তাহাদের কটি ধারণ করিয়া জলগর্ভে আকর্ষণ করিতেছে, তাই কেহ কোথাও যাইতে পারিতেছে না। এক স্থানে চিরকালই অবস্থিতি করিতেছে—আমরা এক বার আষাঢ়ের জলোচ্ছ্বাস দেখিয়াছিলাম, সে দুর্ঘটনার কথা মনে পড়িলে এখনও হৃৎকম্প হয়। নিকটস্থ হ্রদ স্ফীত হইয়া যখন জলবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন দেখিতে দেখিতে বিতস্তা প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তীরস্থ বাটী সকল গলিত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় টুপ্ টুপ্ করিয়া পতিত হইতে থাকে। দীন দরিদ্র হইতে মহাজন পর্য্যন্ত সকলে প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া দূরে পলায়ন করে। অনেকে নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করে, এমন কি মুনসীবাগ জলে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইলে স্বয়ং রেসিডেণ্ট সাহেব এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা স্থল পরিত্যাগ করিয়া জলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। একদিন বেলা প্রায় ৩ টার সময় মহারাজার এক কর্ম্মচারী আমাদিগকে সংবাদ দিল, নদীর জলবৃদ্ধি হইয়া আমাদের বাস-বাটীর নিকটে আসিতেছে, সতর্ক হও। দেখিতে দেখিতে জল আমাদের নিকটে আসিয়া দেখা দিল, আমরা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আপনাপন হস্তে লইয়া নগরস্থ আর্য্যসমাজ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই বাটী কিঞ্চিৎ উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা রক্ষা পাইয়াছিল, অল্প ক্ষণের মধ্যে সে

বাটীর চতুর্দ্দিক জল রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীনগরের প্যারেড রামবাগ, এবং ডাক্তর মিত্রের ও ঋষিবর বাবুর বাটী জলে ভাসিতেছিল। লোকে পথের উপর ছোট ছোট নৌকারোহণ পূর্ব্বক এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে লাগিল। দুই তিন দিন এই ভাবে থাকিয়া, আবার জল সরিতে আরম্ভ হইল, তখন যাঁহারা যেখানে প্রাণ ভয়ে পলাইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার আপন আপন স্থানে উপনীত হইলেন। শুনিতে পাই, এইরূপ মধ্যে মধ্যে জলোচ্ছ্বাস হইয়া শ্রীনগরের অনেক ক্ষতি করে। সহরের মধ্যভাগ এত মলিন যে, নাসিকারন্ধ্র বন্ধ না করিয়া এক পদ গমন করা দুঃসাধ্য। একারণ ভ্রমণকারীরা জল পথেই ভ্রমণ করিয়া দ্রষ্টব্য বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকেন, এই ভাবে আমরা শ্রীনগর যে রূপ দর্শন করিয়াছি, ডাক্তার ইনিসের (Dr. Ince's) পথানুসরণ করিয়া তদ্বিবরণ পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। আহ্লাদের বিষয় এই যে, যে অবধি ডাক্তার মিত্র মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃত্ব স্বয়ং হস্তে লইয়াছেন, সেই অবধি শ্রীনগরের পথ ঘাটের অনেকরূপ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। মিরাকদল হইতে মহারাজগঞ্জ পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত পথ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে, রাত্রে পথে আলোক দিবারও সুব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় এরূপ সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে এ সকল বিষয়ের ভার দীর্ঘকাল ন্যস্ত থাকিলে শ্রীনগরের পুরাতন কলঙ্ক শীঘ্রই স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

জলোচ্ছ্বাস, দুর্গন্ধময় স্থান এবং অপরাপর কয়েকটী ক্ষুদ্র উপদ্রব থাকিলেও গৃহ সকল কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বলিয়া সর্ব্বদাই

তাহাতে অগ্নি লাগিয়া থাকে, এক এক সময়ে এক এক দিক্ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, সুতরাং অগ্নি ভয়ে প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকিতে হয়। শ্রীনগরে অবস্থিতি কালে আমরা তিন বার এইরূপে প্রজাসাধারণের সমূহ কষ্ট দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তদুপরি আবার সেইরূপ গৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাময়িক জলোচ্ছাসের ন্যায় এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটনার হস্ত হইতে কোন কালে যে প্রজারা অব্যাহতি পাইবে, এমন আশা করিতে পারা যায় না।

সহরের দক্ষিণ দিকে যে সমুদয় বাটী দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা মহারাজা ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত মুনসীবাগে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; প্রথম শ্রেণী সপরিবারে থাকিবার নিমিত্ত,—দ্বিতীয় শ্রেণী অপরাপর পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত। গুরমুখসিং-বাগ এবং তারাসিং-বাগ নামক স্থানে স্থাপিত, উহাদের মধ্যস্থলে যে উৎকৃষ্ট একটী দ্বিতল বাটী আছে, তাহাতে কর্ণেল বার (Coll. Burr) বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট সাহেব বাস করিতেছেন, ইহার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে তরুলতা সমাকীর্ণ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তথা হইতে প্রথম সেতু প্রায় ৬০০ হস্ত দূরবর্ত্তী। এই স্থানে অতি অল্প জল, ভাদ্র মাসের শেষে এই খানে চড়া পড়িয়া নৌকাপথ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহারই অনতি দূরে একটী সুপ্রশস্ত ময়দানে যে রমণীয় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে লালমণ্ডী বারাদ্বারি কহে। এখানে সময়ে সময়ে মহারাজা মহোৎসবের আয়োজন করিয়া ইংরাজ পর্য্যটকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। ইহার প্রায় ৫০০ ফিট দক্ষিণে মহারাজার

দাতব্য চিকিৎসালয়। ইহা কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র এম, ডি, মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। তাহার পর দুইটী নূতন ফ্যাসনের রমণীয় অট্টালিকা,—তাহার প্রথমটীতে ডাক্তর মিত্র অবস্থিতি করেন, দ্বিতীয়টী কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব সচিব বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের বাটী। উহাতে এখন কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বারিষ্টার মহাশয় (Barrister-at-law) অবস্থিতি করিতেছেন। ইহারই পশ্চিমাংশে মিরাকদল নামক সেতু। এই সেতু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সেতু সাফাকদল পর্য্যন্ত বিতস্তা নদী নগরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, তাহার উভয় তীর প্রস্তরে বাঁধা, বাটী সকলের গমনাগমনের প্রশস্ত দ্বার নদী পিট বলিয়া সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ ঘাট আছে, এই ঘাটকে ইয়ার বল কহে, স্থানে স্থানে এক একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ইয়ার বল সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্নানের নিমিত্ত মুশলমানদিগের অনেক প্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে, বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এবং শালী ধান্য ভানিবার জন্য বিবিধ প্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল স্থাপিত রহিয়াছে। এখানে হিন্দু স্ত্রী পুরুষেরা প্রায় সকলেই উলঙ্গ হইয়া জলে নামিয়া স্নান করে,মুশলমানেরা সেরূপ করে না, তাহারা জলের উপর ভাসমান কাষ্ঠ-কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নানাদি সমাপন করে, সুন্দর ছোট ছোট বালক বালিকারা উলঙ্গ ভাবে জলে ক্রীড়া করিতে থাকে। তাহার কূলে রূপ মাধুরী সম্পন্না রমণীগণ বৃহৎ বৃহৎ লগুড় হস্তে ধারণ করিয়া এক একটী উদূখলে শালী ধান্য কুটিতে থাকে, ব্রাহ্মণেরা স্নানান্তর অর্দ্ধাঙ্গ জলমগ্ন হইয়া

সূর্য্যার্ঘ্য দিতে থাকেন। তাহার পর জলের কল কল রব, নৌকা সকলের ছপ্ ছপ্ শব্দ তাহাতে মিলিত হয়, তখনকার শোভা দেখিলে মনে এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইতে থাকে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মন্থর গতিতে তরণী যখন গমন করিতে থাকে, তখন নদীকূল ভ্রমণকারীর চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া যায়। বোধ হয় যেন নৌকার গতি বিপরীত দিকে হইতেছে, তাই হঠাৎ চমকিত হইয়া ভাবিতে হয়, আবার কি আমরা বাসায় ফিরিয়া যাইতেছি? এই সেতুর বাম তটে যে কয়েকটী রমণীয় অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রাচীন সেরগড়ী নামক দুর্গমধ্যে স্থিত। দুর্গটী কালের হস্তে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান এবং কাশ্মীরের হাইকোর্ট। ইহার সংলগ্ন যে অত্যুৎকৃষ্ট ভবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রাজপ্রাসাদ, উহাতে আরোহণোপযোগী কয়েকটী কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরের সোপান আছে, তাহার উপর সুদীর্ঘ একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত অধিরোহিণী, উহাই নদী হইতে প্রাসাদে উঠিবার প্রধান পথ। প্রাসাদ প্রস্তর নির্ম্মিত ও অষ্টকোণ-বিশিষ্ট বলিয়া দেখিতে অতি সুন্দর, এবং এই প্রাসাদে মহারাজ প্রতাপসিং বাহাদুর অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

ইহারই পার্শ্বে এবং নদী তটে স্বর্ণমণ্ডিত গদাধর দেবের মন্দির। তাহার পার্শ্ব দিয়া কুট্‌কোল নামে একটি ক্ষুদ্র খাল প্রবাহিত হইয়া টেকীকদল নামক সেতুর নিম্ন দিয়া নগরের পশ্চিম সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক নয়া সেতুর নিকটে আসিয়া আবার বিতস্তায় মিলিত হইয়াছে। এই খালের তীরে

রাজা সার রামসিং বাহাদুরের এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার পর পার এক নূতন সেতু দ্বারা সংযোজিত করিয়া এক মনোরম প্রমোদ কানন নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা সর্ব্বক্ষণই পুষ্পরাশিতে সমাকীর্ণ বলিয়া বিতস্তা হইতে তাহার শোভা অতি রমণীয়।

প্রাসাদের দক্ষিণ কূল কাটিয়া চুঁটকোল নামে একটী প্রণালী উত্তর পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইয়া নাগরিক হ্রদের দ্বার স্পর্শ করিয়া শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্বাংশ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আবার মুনসীবাগের দক্ষিণে আসিয়া বিতস্তায় মিলিত হইয়াছে। উহার গভীরতা অতি অল্প হইলেও নাগরিক হ্রদের নিকাশ উহার সহিত সংমিলিত থাকায় কোন কালে উহা শুষ্ক হয় না। ইহার তীরে রাজতরণী এবং ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগের বৃহৎ বৃহৎ হাউস বোট সকল ভাসমান্ রহিয়াছে। এই পথ ধরিয়া নাগরিক হ্রদে প্রবেশ করিতে হয়, ইহার তীরে চিনার বাগ। তাহাতে নানা জাতীয় পর্য্যটকদিগের শিবির সন্নিবেশিত রহিয়াছে ও মহারাজার স্থপতিকার্য্যালয় (P. W. Workshop)

এই প্রণালীর বাম দিকে এবং বিতস্তার উত্তর তটে বসন্তবাগ, এখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে মহারাজা গো, গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট উৎসব করেন, এই উপলক্ষে দীন দরিদ্র প্রজাদিগকে প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাকেন।

বসন্তবাগের সংলগ্ন যে একটী বাটী আছে, উহাতে মহারাজার যত্নে এক সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, উহাতে একদিন আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের গৌরব সম্বন্ধে এক ব্যাখ্যান দিয়াছিলাম।

মিরাকদলের পর পারে (দক্ষিণ প্রান্তে) এক সুপ্রশস্ত রাজপথ, তাহার দক্ষিণে মহারাজার সেনানিবাস এবং পারেড ভূমি, পূর্ব্ব বিভাগে রামবাগ, হ্রদ গঙ্গার উপর সংস্থাপিত, এই স্থানে স্বর্গগত মহারাজ গোলাপ সিংহের সমাধি মন্দির, মন্দিরের চতুঃসীমা অতিথি-শালায় পরিবেষ্টিত। স্থানটী যেমন রমণীয়, তেমনি নির্জ্জন, চতুঃপার্শ্বে পুষ্প-কানন থাকায় সমাধিপ্রিয় সাধুদিগের অবস্থিতির বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই স্থানের এক নিভৃত প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া আমরা অনেকক্ষণ ভগবানের অনন্ত মহিমার বিষয় চিন্তা করিতে-ছিলাম, আর সংসারের ক্ষণস্থায়িত্বের ইতিহাস পড়িতেছিলাম। হিন্দুদিগের পতনের পর মুসলমান সম্রাটেরা একদিন এই স্থানের অধীশ্বর ছিলেন, প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল কত যত্নে মহারাজ গোলাপ সিংহ এই কাশ্মীর রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এখানে কত কাল কত সুখ ভোগ করিবেন, এখন তিনি কোথায়? এক মুষ্টি ভস্ম-রূপে পরিণত হইয়া এখানে প্রোথিত রহিয়াছেন! ইহার পশ্চিমে সেরগড়ী নামক দুর্গ এবং প্রাসাদ শ্রেণী বিতস্তার কূলে শোভমান রহিয়াছে, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। পরে হাবাকদল দ্বিতীয় সেতু, ইহার সন্নিকটে মহাজনদিগের কয়েকটী ব্যাঙ্ক (Banks) আছে, এবং কাশ্মীরীদিগের সমত্বসম্ভূত বিপণি (co-operative store-house) ও শিখদিগের শ্রীগুরুসিং সভা শোভমান রহিয়াছে। সর্দ্দার হরনাম সিং এই সভার সভাপতি; তাঁহার প্রযত্নে এক দিন আমরা এই সভার কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রায় ৩৫০

বৎসর গত হইল মহাত্মা নানক যে সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন,ভক্তি ও সেবা সেই ধর্ম্মের মূল। শিখেরা যখন প্রেম-প্রণোদিত হইয়া, ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া, সমস্বরে সকলে একত্র হইয়া ভগবানের স্তুতি পাঠ করিতে থাকে, তখনকার শোভা অতি রমণীয়, তাহার পর একটী ভজন গীত হয়, তদনন্তর মধুময় কড়া প্রসাদ (হালুয়া) বিতরিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। এতকাল কাশ্মীরে শিখদিগের কোনরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইত না, এখন মহারাজ প্রতাপ সিংহের প্রতাপে তাঁহা-দিগের এরূপ জীবন্ত ভাব দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লা-দিত হইলাম। নানকের পুত্র শ্রীচন্দ, উদাসীপন্থা অবলম্বন করিয়া যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তখন এখানে আসিয়া একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মঠের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত সম্প্রতি শিখদিগের একটী মহোৎসব হইয়াছিল। সে উৎসবে আমরা উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি, এ দেশে শিখের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে, শিখেরা হিন্দুদিগের সহিত যথেষ্ঠ সদ্ভাব রক্ষা করিয়া শ্রীচন্দের প্রচারিত ধর্ম্মের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ স্থানের অনতিদূরে সাহ হাম-দিনের জিয়ারত, ইহা মুসলমানদিগের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি। কথিত আছে, বহুকাল এই স্থানে কালী দেবীর এক মন্দির ছিল, মুসলমানেরা কালীদেবীর মন্দিরটী ভূতলশায়ী করিয়া তদুপরি এই জিয়ারত নির্ম্মাণ করে; তৎকালে ভূগর্ভ হইতে গভীর রাত্রে এক বাণী নির্গত হয়, তাহার অর্থ এইরূপ— “যদি কেহ আমার সেবক থাকে তাহা হইলে আমাকে উদ্ধার করুক,” মহারাজ গোলাপ সিংহ নাকি ইহা শ্রবণ

করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই, সুতরাং অদ্যাবধি দেবীর পরিত্রাণ হয় নাই। সে যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জিয়ারতের পাদদেশে এক দেবী মূর্ত্তি খোদিত আছে, সহস্র সহস্র হিন্দুরা সিন্দুর, চন্দন লইয়া প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, উপরে মুসলমানেরা আজান দেয়। এক স্থানে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিবাদে পূজা করিতেছে ভারতের কেবল এই স্থানেই দৃষ্ট হয়।

শাহ হামদীনের অপর দিকের বাম তটে আর একটি পুরাতন মসজিদ আছে, উহার নাম নয়া মস্‌জিদ। ভারতবিখ্যাত নুরজাহান ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রায় ৪০০ ফিট্ দূরে জানাকদল চতুর্থ সেতু, ইহার দক্ষিণ দিকে একটী ভগ্ন বাটী আছে, উহাকে বাদশাহ কহে, বিখ্যাত জালাল-উদ্দিন ঘোরী ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে রাজত্ব কালে এই বাটী নির্ম্মাণ করেন, তিনি অতি প্রতাপ-শালী রাজা ছিলেন, প্রায় ৫৩ বৎসর কাশ্মীরে একাধিপত্য করিয়া এ দেশের শিল্প সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তুর্কিস্থান হইতে ইনিই প্রথমে তন্তবায় আনাইয়া কাশ্মীরে শাল প্রস্তুত করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করেন, এবং পেপার মেসি কার্য্য ও কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা প্রদান করেন, সেই জন্য কাশ্মীরীরা অদ্যাপি তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে, এবং তাঁহার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নামের ঐ সেতু জানাকদল বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার অনতিদূরে জুম্মা মস্‌জিদ ; বাদসাহ সাহজেহান ইহা

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহার সন্নিকটে যে বাজার দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা স্বর্গগত মহারাজ রণবীর সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, একারণ ইহাকে মহারাজগঞ্জ কহে। ইহার প্রায় ৬০০ ফিট অন্তরে আলীকদল পঞ্চম সেতু, ইহার নিকটস্থ প্রাচীন মসজিদকে বুল্ বুল্ লস্কর কহে। কথিত আছে, বুল্ বুল্ শাহ নামক এক ফকির এখানে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া এ দেশে সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার পর এই স্থানেই তিনি কবরশায়ী হন। ইহার পরবর্ত্তী ষষ্ঠ সেতুকে নয়াকদল কহে, ইহার অপর পারের দক্ষিণ তটে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজকাকার বাটী, ইহারই বাম পার্শ্ব দিয়া কুট্‌কোল, শেরগড়ী প্রাসাদ তলবাহিনী হইয়া এই স্থানে বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে, লচ্‌মন্‌জু-র-ইয়ার বল, এই ঘাটের কিয়দ্দূরে ইদ্‌গা নামক মুসলমানদিগের নেমাজ স্থান, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল, এবং প্রস্থে ½ মাইল, ইহার চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ-সকল আকাশ পথ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, ইহার পূর্ব্ব ভাগে মার প্রণালী প্রবাহিত। উত্তরে সুবৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত আলী মসজীদ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহার পর সপ্তম সেতু সাফাকদল শ্রীনগরের শেষ সীমা—সেতুর বাম তটে সাহ নেমাইতুল্লার মসজিদ, ইহার এক প্রস্তর ফলক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, প্রায় ২০০ বৎসর অতীত হইল, সেফ্‌খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীনগরের রাজবাটীর উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত মস্তকোত্তোলন করিয়া যেন শ্রীনগরের শ্রীবৃদ্ধি পরিদর্শন করিতেছে, উহার নাম শঙ্করাচার্য্য। শ্রীনগরের সমতল ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১১০০ ফিট্, ইহা এমত স্থলে স্থিত যে, ইহার শিখর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রীনগরের চতুর্দ্দিক অতি সুন্দররূপে দৃষ্টি করা যায়। হিন্দুধর্ম্ম পতনের পর, যখন বৌদ্ধেরা ভারতে একছত্রী হইয়াছিল, তখন, কথিত আছে, প্রায় ২০০০ বৎসর অতীত হইল, অশোক রাজার পুত্র জলোকা এখানে একটী বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার পর ভারতের গৌরব মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যখন বৌদ্ধধর্ম্ম পরাভব করিবার নিমিত্ত ভারতের চতুর্দ্দিকে আর্য্য ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করেন, তখন এই বৌদ্ধমঠে শিবস্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অদ্যাবধি এই শিখরভূমি শঙ্করাচার্য্য 'নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছে। এই স্থান হইতে কাশ্মীরের সমস্ত সমতল ভূমি সুন্দর রূপে দৃষ্টি করা যায়, সুতরাং সৃষ্টির রমণীয়তা এক কালে নয়ন পথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ প্রদান করে। পশ্চিমদিকে উলার হ্রদের জলরাশি, দক্ষিণে তুষার মণ্ডিত গুলমর্গ প্রভৃতি গগন ভেদী পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে স্রোতস্বতী বিতস্তা সর্প গতির ন্যায় বক্রভাবে শ্রীনগর পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা। শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর

শালের দৌড়দারের চিকণ কার্য্য ঐরূপে করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। (কাশ্মীরী শালের কিনারায় যে সুন্দর সূচীকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঠিক ঐ স্থানের অনুরূপ)। উত্তরে মেঘমালার ন্যায় হিমালয়শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া রহিয়াছে, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বস্তুতঃ প্রকৃতির এত শোভা, এক স্থানে একাধারে কখন কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দিরের ভিতরে দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে, উহাতে পারস্য ভাষায় এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে দৃষ্ট হয়—"সম্বৎ ৫৪ সালে হাজি হস্তি নামক স্বর্ণকার এই লিঙ্গ প্রস্তুত করেন," অপরটীতে—যিনি এই লিঙ্গ স্থাপিত করেন, তিনি মির্জার পুত্র কোয়াজা রুকম। দুইটী নাম দেখিয়া ("হাজি, মির্জা") স্পষ্ট অনুমিত হইবে তাঁহারা যবন ধর্ম্মাবলম্বী। শঙ্করাচার্য্যে মুসলমান কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কেমন কথা বুঝিতে পারিলাম না। অন্যদিকে মুসলমানেরা ইহাকে "তক্ত সলিমান' অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীন কালের রাজা "সলমনের" সিংহাসন কহিয়া থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্র ধরিয়া ইহার মৌলিকতা প্রমাণ করিতে গেলে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, বৌদ্ধদিগের পরাভবের পর শঙ্করাচার্য্য তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার কয়েক শত বৎসর পরে মুসলমানেরা ভারত অধিকার করে। তাহার পর প্রায় ৩৫০ বৎসর অতীত হইল, কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য মোগল সম্রাটদিগের চিত্তাকর্ষণ করে, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রায় প্রতি বৎসর নিজ প্রণয়িনী নুরজাহানকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্জাব হইতে এখানে আসিতেন, নিশ্চয় সেই সময় হইতে মুসলমানদিগের বহুতর কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়, যাহার

বৃত্তান্ত ডাক্তার ডিউক আপনার কাশ্মীর গাইডে বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই সময়েই ইহাঁরা শঙ্করাচার্য্যের শোভায় বিমোহিত হইয়া ইহাকে যে "তক্ত সলিমান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? অন্য দিকে মুসলমানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবে এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। অনুমান হয় হস্তি নামক স্বর্ণকার এই লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন, এবং "রুকম বা রুক্মিণী" নামক কোন ব্যক্তি এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। মুসলমানেরা "তক্ত সলিমান' কথা বলবৎ রাখিবার নিমিত্ত, চাতুরিজাল বিস্তার করিয়া হস্তির পূর্ব্বে 'হাজি', এবং 'রুক্মিণী' কে বিকৃত করিয়া 'রুকম', এবং তাহার পূর্ব্বে 'কোয়াজা' এই শব্দ সংযোগ করিয়া হিন্দুর কীর্ত্তি মুসলমান নাম দ্বারা লোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আর কি অনুমিত হইতে পারে? যাহা হউক মন্দিরটি অতি রমণীয় স্থানে সংস্থাপিত, শঙ্করাচার্য্যে উঠিবার জন্য মহারাজ গোলাপ সিং সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এখন তাহার ভগ্নাবস্থা, সুতরাং উঠিতে কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ হয়, মন্দিরটি অষ্ট কোণ বিশিষ্ট, দ্বার পূর্ব্বাভিমুখে, চতুর্দ্দিকে সুপ্রশস্ত চাতাল, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুপ্রশস্ত উৎস ছিল, এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উত্তরে সাধুদিগের অবস্থিতির জন্য কয়েকটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত রহিয়াছে, কিন্তু এখন জলাভাবে কেহই সেখানে বাস করে না, যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টার জন্য আসিয়া শিবের অর্চ্চনা করিয়া সহরে ফিরিয়া যায়। প্রাচীন শিবলিঙ্গটী মুসলমানদিগের দ্বারা বিকৃতাঙ্গ হইয়াছিল

বলিয়া রাজা সার রামসিংহ সম্প্রতি একটী নূতন শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তৎস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। পুরাতন লিঙ্গটী ভগ্ন দশায় স্থানান্তরে পতিত রহিয়াছে, মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ প্রায় ১৪ ফিট্, মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে প্রবেশ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, জানিনা কত মহাজন এখানে বসিয়া যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন; আমরা যখন লিঙ্গটী পরিবেষ্টন করিয়া নিমীলিত নয়নে অবনত শরীরে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ ছিলাম, তখন এক অপূর্ব্ব ভাব অন্তরে অনুভব করিলাম। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অসীম জ্যোতি আমাদিগের হৃদয়ে যেন প্রতিফলিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে আমরা স্তম্ভিত হইয়া কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলাম, ভগবন্! বৌদ্ধদিগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া একদিন ভারতের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, আবার ভারত বিধর্ম্মীদিগের তাড়নায় প্রকম্পিত হইতেছে, কবে আসিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিবে? কবে ভারতের এ অবিশ্বাস রূপ অন্ধকার বিদূরিত হইবে? কবে আবার আমরা সেই নির্ব্বাণ-ষটকের মুগ্ধকর স্তোত্র পাঠ করিয়া শিবময় জীবন লাভ করিব?

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপং,
বিভুর্ব্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

হরি পর্ব্বত।

শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, এই পর্ব্বতের চতুঃসীমায় ভগ্নাবশেষ দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ইহা কোন কালে মহানগরীতে পরিণত ছিল, মহাপ্রস্থানে দেবী দ্রৌপদী যে হরিপর্ব্বতে নিপতিতা হন, মহাভারতে উল্লেখ আছে, ইহা সেই হরি পর্ব্বত কিনা স্থির করা সুকঠিন। তবে পাণ্ডবেরা যে এখানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তর নিদর্শন এ দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কাশ্মীরের পুরাতন ইতিহাসে দ্রৌপদী-প্রসঙ্গে একথার কোন উল্লেখ নাই। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফিট হইবে, মুসলমানদিগের ভারত ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আকবর সা ইহার চতুর্দ্দিক দুর্ভেদ্য প্রস্তর প্রাকারে পরিবেষ্টিত করেন, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মাইল, উচ্চতা ১৮ হস্ত, প্রস্থ ৮ হস্ত এবং তাহার এক শত হস্ত অন্তরে এক একটী প্রহরীর স্থান আছে। ইহার তিনটী প্রবেশ দ্বার, দক্ষিণে কাটী, পশ্চিমে বাটী, এবং উত্তর পশ্চিমে সঙ্গীন দ্বার নামে অভিহিত হয়, এই পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে, দুর্গের মধ্যে দুইটী মন্দির আছে, একটীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, অপরটীতে শ্রীনগরের আদ্যাশক্তি শারীকাদেবী বিরাজমান রহিয়াছেন।

কাশ্মীরের পৌরাণিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন সৃষ্টির প্রথমে জলরাশি সরিতে আরম্ভ হয়, তখন মহর্ষি কশ্যপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া শারীকা দেবীকে এখানে প্রতিষ্ঠা

করেন, সেই অবধি কাশ্মীরে কত রাজ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শারীকাদেবীর মাহাত্ম্য অদ্যাপি অণুমাত্র নষ্ট হয় নাই, আমরা শারীকাদেবী দর্শন করিয়া সেখান হইতে কোন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

২৮শে জুলাই শনিবার ১৮৯৪—সম্প্রতি আমরা এখানে আসিয়া হরি পর্ব্বতে তিন দিন অবস্থিতি করিতে গিয়াছিলাম, কথিত আছে, এই স্থানে কশ্যপ মুনি শারীকাদেবী নামে তীর্থ স্থাপন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা এই শারীকা দেবীর পাদমূলে তিন দিন অবস্থিতি করি। এ স্থান শ্রীনগরের রাজবাটী হইতে প্রায় ৩ মাইল, শ্রীনগর সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৫২০০ ফিট উচ্চ, তথা হইতে শারীকাদেবী প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ,নাগরিক হ্রদের তীরে অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, এখানে অপরিমিত কাগ্‌-জি ও বাদাম জন্মে, বাদামের গাছগুলি ঠিক নিসিন্দা গাছের মত। একটী গাছে বিস্তর বাদাম হয়, এখানে আমরা কচি বাদামের তরকারী ও কচি বাদাম ভাজা আর অষ্ট প্রহর কাঁচা বাদাম খাইয়াছি ; কিন্তু কোন অসুখ হয় নাই, প্রতি শনিবার, মঙ্গলবার, ও অষ্টমীতে এখানে মেলা হয়। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা সপরিবারে সে সময়ে এখানে প্রায় সমস্ত দিন পূজা উপ-লক্ষে উপস্থিত থাকেন। গত মঙ্গল বার আমরা তথায় উপস্থিত থাকায় একটী মেলা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদিগের রূপের কথা কি লিখিব, তোমাদের দালানে কত রূপ প্রতিমা দেখিয়াছি, তাহাই রূপের আদর্শ

বলিয়া আমরা মনে করিতাম, বস্তুতঃ তাহা নহে, এ জীবন্ত রূপের ছটা দেখিলে, সে প্রতিমার রঙ্ মলিন বা বিরূপ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ অঙ্গ সৌষ্ঠবের ঠাম আমরা বুঝি না, তাই আমাদের দেশের কুমারেরা ও রূপ কুরূপ করিয়া তুলে, রঙে ঢাকা থাকে বলিয়া আমরা অত ভাল করিয়া দেখি না, ডাকের সাজ আর হরিতালের রঙ্ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখে, নচেৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলে আমাদের রুচির ভুল ধরা পড়ে, * এ রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি কালি-দাস অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, তখন আমি কে? বস্তুতঃ এ রূপের গঠনের, গমনের ভাব দেখিলে ভাবুকের হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিবে বিচিত্র কি? তাঁহাদের গাত্রে অলঙ্কার কিছুই নাই বলিলেই হয়, (কাণে, মুখে, নাকে, মাথায় কিছুই নাই) কেবল এক একটী 'ফারণ" পরা, (গলা হইতে পা পর্য্যন্ত পিরাণের মত একটা জামা) মাথায় সাদা গোল এক রকমের টুপি, কটিতে এক খান ক্ষুদ্র গামছার মত দোবজা জড়ান, পায়ে কাহার খড়ম কাহার ঘাসের জুতা কেহ খালি পা, এই তো পোষাক! তাহাতেই স্থান আলো করিয়া রহি-য়াছে। পূজা সাঙ্গ করিয়া যখন তাঁহারা শারীকাদেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া পর্ব্বতের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়েন, তখন দেখিলে (কল্পনা নহে বস্তুতঃ) হরিপর্ব্বতকে অমরাবতী বলিয়া

---

* "কিন্তু তেমন শিল্পী কর্তৃক গঠিত না-হইলেও আজ কাল যে রকম অশিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয়, সেই রকম শিল্পী কর্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য মূর্ত্তি দেখিতে পায়" হিন্দুত্ব-২৬৮ পৃষ্ঠা।

বোধ হয়, যেন অপ্সরাগণ ভ্রমণ করিতেছে, পণ্ডিতেরাও যাহার পর নাই রূপবান এবং ধার্ম্মিক, পূজা অর্চ্চনা ব্যতীত তাঁহাদের যেন অন্য কোন কার্য্য নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, শুনিলাম সহরে ব্রাহ্মণের কন্যা বেশ্যা নাই, সুতরাং এরূপ সুযোগ ব্যতীত, হিন্দু রমণীদিগকে দেখিবার অন্য উপায় নাই, এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি প্রাচীন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই, সেই কৌপিনধারী ঋষিগণ, উপরে সেই একমাত্র "ফারণ" মস্তকে উষ্ণীষ, তাহাতে দাড়ী গোঁপ থাকায় ঠিক তপস্বী বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, শারীকা দেবী এক খানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, তাহাতে বহুকাল হইতে সিন্দুর, চন্দন চর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে, এবং তন্মধ্যে এক মহা যন্ত্রের চিহ্ন আছে, হঠাৎ দেখিলে রক্তিমাভ এক খণ্ড মেঘ বলিয়া বোধ হয়, আবার সূর্য্য কিরণ তাহর উপর প্রতি-ফলিত হওয়ায়, সমগ্র দৃষ্টি এক কালে এক স্থানে রক্ষা করা যায় না। সুতরাং সেই বিজলী বিলোড়িত বিচিত্র স্থান দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ঐ গৌরিপট্টে নানা প্রকার রূপ অঙ্কিত দেখা যায়, প্রাতে পাণ্ডারা নানা ফুলে সে অঙ্গ সজ্জিত করে বলিয়া পদ্মরাশি সমাকুল বোধ হয়, কিন্তু সায়াহ্নে আর সে রূপ থাকে না, সে গৌরি-পট্ট এখন কুমারী গৌরি রূপে প্রতিভাত হইতে থাকেন, তাঁহার সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, রক্তিমাভ ওষ্ঠ, স্পষ্ট লক্ষিত হয়, যেখানে মহর্ষি কশ্যপ তপস্যা করিয়াছিলেন, সে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া প্রতি দিন দুই বেলা আমরা

যোগাভ্যাস করিতাম, তাহাতে যে শান্তি লাভ হইত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ যৎকালে দক্ষ যজ্ঞে পতি-নিন্দা শ্রবণে সতী দেহ ত্যাগ করেন এবং ধূর্জটি সেই মৃতদেহ শিরে ধারণ করিয়া উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন, তৎকালে চক্রপাণি সুদর্শন চক্র দ্বারা উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তন্ত্র শাস্ত্রে কথিত আছে, সতীর কণ্ঠদেশ কাশ্মীরে পতিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে শারীকা নামে শক্তির এই স্থানে আবির্ভাব হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ এখানে প্রকৃতি দেবীর মাহাত্ম্য যোগাসনে বসিলে সহজে অনুভব করা যায়।

এই মন্দিরের শিখরোপরি আর একটী মন্দির আছে, ভগবান ভূতভাবন্ ভবানীপতি সেখানে চির বিরাজমান রহিয়াছেন, সে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অষ্ট প্রহর প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে, মঞ্চে বড় বড় কামান সজ্জিত, তাহার উপর মহারাজার বিজয় পতাকা উড়িতেছে দেখিলে ভাবুকের মনে এই ভাবের উদয় হয়, যেন যখন ধূর্জটি সতী বিরহে কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সতী শারীকা রূপে উপস্থিত হইয়া ভৈরবের গললগ্ন হইলেন। সতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী শিব তাহা যেন সহ্য করিতে না পারিয়া এই সঙ্কট স্থানে আসিয়া নিমীলিত নয়নে কেবল মাত্র সতীর ধ্যানে চির যোগনিদ্রায় সমাহিত হইলেন। রাজলক্ষ্মী শারীকা তাহাতে লজ্জিতা হইয়া শিবের নিদ্রাভঙ্গ যাহাতে না হয়, তাহা করিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে অষ্ট প্রহর প্রহরী

নিযুক্ত করিয়া, আপনি তাহার নিম্নে পা ছড়াইয়া কাশ্মীরে যেন নিজ গৌরব প্রচার করিতে বসিলেন।

শিবের মন্দির যে প্রকোষ্ঠে সংস্থাপিত, তাহার মধ্যে সহজে কাহারও যাইবার ক্ষমতা নাই। সে স্থান মহারাজার শস্ত্রাগার, রাজদরবারের অনুমতি পত্র ব্যতীত কাহারও সে স্থানে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা এই সমাধিস্থ শিবের চরণতলে বসিয়া তাই ভাবিতেছিলাম, আর শ্রীনগরের শোভা পরিদর্শন করিতেছিলাম।

নাগরিক হ্রদ।

কাশ্মীরী ভাষায় হ্রদকে ডল্, সরোবরকে বল্, এবং উৎসকে নাগ কহে। এখানে উলার হ্রদ এবং নাগরিক হ্রদ প্রধান, এ স্থলে নাগরিক হ্রদের বিষয় কথঞ্চিৎ বর্ণন করা যাইতেছে।

রাজবাটীর সম্মুখ হইতে চুটকোল নামক প্রণালী পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া, যাহা বিতস্তা হইতে প্রবাহিত হইয়া নাগরিক হ্রদে মিলিয়াছে, ইহাই তাহার গমনাগমনের পথ, চুটকোলের প্রবেশ দ্বারে মহারাজার পালিত নানা বর্ণের হংস সকল নির্ভয়ে কেলি করিতেছে, এবং নানাবিধ মনোহর রাজ-তরণী ভাসমান রহিয়াছে। তাহার প্রায় ৪০০ ফিট্ গমন করিলে ডলের প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু-দ্বার নয়ন পথে পতিত হয়, উহার নাম গাওকদল। ঐ সেতুর বামপার্শ্বে সুদৃশ্য সফেদা শ্রেণী এবং ঘন মেঘ বর্ণ সমাকীর্ণ একটী সুন্দর উপবন। উহাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে বাম দিকে মনোহর চেনার

বাগ। ইহাতে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারীরা পরমানন্দে বাস করিতেছেন। এখানকার চেনার বৃক্ষ সকল (ইহাকে ইংরাজিতে Poplar কহে) অতি বৃহৎ ও বিস্তৃত। কয়েকটী বৃক্ষে বাগ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের শাখা এবং পল্লব সকল এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, দুই প্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের কিরণ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং বিনা তাম্বুতেও অনায়াসে এখানে অবস্থিতি করা যাইতে পারে। ইহার অনতিদূরে দ্রোগ্‌জন নামক হ্রদের দ্বার, সেরগড়ী প্রাসাদ হইতে ইহা প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে স্থিত, নৌকাপথে ৪০ মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছান যায়। দ্বারটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, নদীর জল বৃদ্ধি হইলে বদ্ধ ও হ্রাস হইলে আপনাপনি খুলিয়া যায়। সুতরাং জলোচ্ছাস সময়ে হ্রদের পার্শ্বস্থ গ্রাম, নগর ও ভূমি সহজে প্লাবিত হইতে পারে না, দ্বারের উপরিভাগে সেতু আছে, এবং তথা হইতে একটী সুদৃঢ় বাঁধ নির্গত হইয়া নগরকে হ্রদ হইতে পৃথক রাখিয়াছে। কোন্ সময় যে এরূপ সুপ্রশস্ত বাঁধ এবং সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়া শ্রীনগরকে জল প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, পুরাতন ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থানের গভীরতা প্রায় ৩০ হস্ত।

হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ৩ মাইল, ইহার গভীরতা গড়ে ৮ হস্তের অধিক হইবে না। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর, নিম্নদেশ ও পার্শ্বস্থ অসংখ্য উৎস হইতে ইহার জল উৎপন্ন হইয়া অনবরত প্রবেশ দ্বার দিয়া নির্গত হইতেছে, তথাপি জলের হ্রাস বৃদ্ধি সকল সময় অনুভব করা

যায় না। এতদ্ব্যতীত ইহার উত্তর পশ্চিম ভাগস্থ অত্যুন্নত গিরিমালা হইতেও অনেক বারিধারা নির্গত হইয়া পতিত হইতেছে, ইহাতে অনেক প্রকার জলজ পুষ্প, ফল ও লতা উৎপন্ন হয়, স্থানে স্থানে অপরিমিত পাণি ফল জন্মে; কমল ও কুমুদ বনের শোভাও অতি রমণীয়, ইহাতে নানা প্রকার মৎস্য জন্মে, মধ্যে মধ্যে এক একটী দ্বীপ, তাহার কোন কোনটীর উপর কৃষকের ক্ষেত্র ও লোকালয় দেখিতে অতি চমৎকার, এবং চতুঃপার্শ্বে বাসবের নন্দন কানন সদৃশ মনোহর উপবন, ইহার তিন পার্শ্ব প্রায় ৩০০০ ফিট দীর্ঘ পর্ব্বত মালায় পরিশোভিত, দ্বারের উত্তর দক্ষিণ দুই পার্শ্বে হরিপর্ব্বত এবং শঙ্করাচার্য্য উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকায়, হ্রদটী দেখিতে অতি রমণীয়। প্রবেশ দ্বার হইতে প্রায় ২০ মিনিটের পথের বামে ভাগে যে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে উহার নাম বুদ্‌মর্গ। ঐ স্থানের একটী ঘাটে দ্বাবিংশতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। উহাতে শাল এবং পশমী বস্ত্র ধৌত হয়, এখনকার জলের এমন গুণ যে, উহাতে পশ্মীনা ধৌত হইলে যে রূপ সুকোমল ও সুচিক্কণ হয়, উহার এক পাদ অন্তরে সেরূপ হয় না। উহার অনতিদূরে একটী বৃহৎ বাঁধ আছে, তাহাতে কয়েকটী পুরাতন সেতু দৃষ্ট হয়, উহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল এবং প্রস্থ গড়ে ৮ হস্ত; উহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক ভাসমান ক্ষেত্র আছে, উহাতে কাঁকুড়, শশা, তরমুজ, খরমুজ, মুলা, বেগুন প্রভৃতি নানাবিধ শাক্ সব্‌জী উৎপন্ন হয়। এত গভীর জলে ক্ষেত্র সকল কি রূপে ভাসমান রহিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উহা বিলক্ষণ দৃঢ়, এক দিন আমাদের এক ভৃত্য

নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ক্ষেত্রের উপর পড়িয়া কয়েকটী খরমুজ তুলিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে ক্ষেত্রটী জলমগ্ন হয় নাই। ভাসমান ক্ষেত্র কিরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যে স্থানের জল গভীর নহে, তথায় জলজ লতা কাটিয়া ভাসাইয়া দিলে, স্রোতের গতি খরতর নহে বলিয়া ছিন্ন-মূল লতা গুলি প্রায় সেই স্থানেই ভাসিতে ভাসিতে পচিয়া একত্র হয়, তাহার পর কৃষকেরা তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনজ লতা ও মৃত্তিকা জমাইতে থাকে, এই প্রকারে ৫।৬ স্তর করিতে পারিলে উহা বেশ দৃঢ় ও কৃষি-কর্ম্মোপযোগী ক্ষেত্র রূপে পরিণত হয়, তখন তাহার উপর বীজ রোপণ করিলে অচির কাল মধ্যে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া অপর্য্যাপ্ত ফল পুষ্প প্রসব করে। ঐ সকল ভাসমান ক্ষেত্র যাহাতে সহজে স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তাহার জন্য কৃষকেরা উহার দুই প্রান্তে বড় বড় খোঁটা পুতিয়া দেয়। এইরূপ এক এক স্থানে অনেক ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে এবং উহার উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট বলিয়া প্রচুর শাক সবজী ফল মূল উৎপন্ন হয়। শুনিতে পাওয়া যায় প্রতি বৎসর লক্ষাধিক মুদ্রা রাজকর ইহা হইতে আদায় হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই সকল ক্ষেত্রাংশ চুরি হইয়া থাকে। ধূর্ত্ত কৃষকেরা ইহার খোঁটা উবড়াইয়া ফলফুল পূর্ণ ক্ষেত্র খণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া এমন ভাবে আপনাপন ক্ষেত্রে সংলগ্ন করিয়া দেয় যে, সহজে কেহ তাহা আপনার ক্ষেত্র বলিয়া চিনিতে পারে না। সে জন্য ক্ষেত্র চুরির মামলা সময়ে সময়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং বিচারকেরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া অপহৃত

ক্ষেত্র আদালতে টানিয়া আনাইয়া যথারীতি বিচার কার্য্য সম্পাদন করেন।

এই হ্রদের ঠিক পশ্চিম দিকে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পথে মুসলমানদিগের একটি বৃহৎ মসজিদ আছে, এবং তাহার সন্নিহিত গ্রামকে হজরৎ-বল কহে। মস্‌জিদটী দেখিতে অতি সুন্দর, তাহার অভ্যন্তরও নানাবিধ বিচিত্র কারুকার্য্যে পূর্ণ, এবং ঝাড় ও লণ্ঠনাদি দ্বারা শোভিত, তাহার এক প্রান্তে শ্বেতবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠ আছে, উহাতে রজত কার্য্য জড়িত একটী সুন্দর কাচের নলের মধ্যে এক গাছি-কেশ আছে। কিম্বদন্তী এই, উহা মহম্মদের শ্মশ্রুলোম। প্রতি বৎসর এখানে চারিটি মেলা হইয়া থাকে. তন্মধ্যে শ্রাবণ মাসে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ মেলায় বহুদূর হইতে কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলে সপরিবারে আগমন করিয়া থাকে মৌলবীরা উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করতঃ উচ্চরবে কোরাণ পাঠ করিতে থাকেন, কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে থাকেন, মস্‌জিদের অধিনায়ক তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বোক্ত নলটী ঊর্দ্ধে ধারণ করতঃ দর্শকদিগকে মহম্মদের শ্মশ্রু লোম বলিয়া প্রদর্শন করেন, দর্শকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া মহম্মদের গুণগান করিতে করিতে তাহা দর্শন করে ও সেলাম করে। আমরা সেদিন সে মেলায় উপস্থিত ছিলাম, দর্শকবর্গের মধ্যে অনেকে ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া গদ্‌গদ্ ভাবে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বস্তুতঃ মহম্মদের

প্রতি মুসলমানদিগের ভক্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন পাদ্‌রী একবার কোন এক স্থানে কহিয়াছিলেন যে, "জগতে মহম্মদের শরীরের যত প্রকার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, যদি সমস্ত এক স্থানে একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ ৯ মণের ন্যূন হইবে না।" যাহা হউক, মুসলমানদিগের মত যদি আমাদের স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আর্য্যদিগের গৌরব কোন কালেই বিলুপ্ত হইতে পারিত না।

ইহার পরেই দিল্লীর সম্রাটদিগের নানাবিধ প্রমোদ কানন চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত রহিয়াছে। তাহাদের নাম (১) নসীমাবাগ, (২) শালামারবাগ, (৩) নিষাদবাগ, (৪) সোণালং বা স্থবর্ণদ্বীপ (৫) চশমাসাহী বা প্রধান উৎস, এবং (৬) পরিমহল। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎস ও গ্রাম আছে, তাহা কাশ্মীরের ইতিহাস না পড়িলে সমগ্র অবগত হওয়া সুকঠিন। উদ্যান সকল (১), (২) (৩), অতি রমণীয়। যাঁহারা লাহোরের শালামারবাগ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ঐরূপ স্তরে স্তরে পাহাড়ের উপর ত্রিতল হইতে সপ্ততল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু বিশেষ এই, লাহোরের শালামারে কতকগুলি ফোয়ারা শ্রেণী ব্যতীত প্রকৃতির শোভা তত চমৎকারিণী নহে। এ সকল বাগান সমোচ্চ পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি হইতে ক্রমে ক্রমে তালায় তালায় নিম্নে আসিয়া সুদূরের হ্রদে মিলিত হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উৎস সকল অতি রমণীয় ভাবে উত্থিত হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া, ছড়াইয়া পড়িয়া নাচিতে নাচিতে ভূতলে আসিয়া পতিত হইতেছে, এবং তাহার চতুর্দ্দিকের ফুয়ারা সকল, ঐ উৎস সকলকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া তাহাদের

পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল নানাবর্ণের ফুল ফলে সমাকীর্ণ হইয়া সহচরীর ন্যায় তাহাদের চতুর্দ্দিকে বসিয়া মন্দ মন্দ মারুত হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া পত্র সঞ্চালন দ্বারা যেন করতালি প্রদান করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে গগনভেদী চিনার বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া উপস্থিত আনন্দের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না দিবার জন্যই যেন পত্র সঞ্চালন করিয়া "ভয় নাই" "ভয়-নাই" বলিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছে। এই সকল প্রমোদ কাননের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত, সম্রাটদিগের অতি রমণীয় বিলাস ভবন আছে, এই সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া দেখিলে আনন্দে হৃদয় কেবল উৎফুল্ল হইয়া উঠে এমন নহে, মুসলমান সম্রাটদিগের বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার কীর্ত্তি-কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

চশমাসাহী।

এই কয়টী বিলাস কাননের অনতি দূরে চশমাসাহী (চশমা—উৎস, সাহী—বাদসাহী=উৎসের বাদসাহ,) শুনিতে পাওয়া যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের সমস্ত উৎসের জল পরীক্ষা করিয়া, এই উৎসের জল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থির করিয়া, ইহারই জল পান করিতেন, এবং সেজন্য চশমাসাহী বলিয়া ইহাকে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা যে পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উপর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে সুন্দর কানন

রমণীয় ফুল ফলে সুসজ্জিত রহিয়াছে, উৎসনিঃসৃত জলধারা সারে সারে প্রবাহিত হইয়া ইহাদিগের জীবনোপায় হইয়া রহিয়াছে। জল যেমন নির্ম্মল ও তরল, তেমন স্বাদু ও পাচক গুণ বিশিষ্ট। এ জল পান করিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আমরা এই উপবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং এই উৎসের অমৃতোপম জল পান করিবার নিমিত্ত ইহার নিকটস্থ ডাক্তার সূর্য্যবলের উদ্যান বাটীতে ৯ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া হ্রদের চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যান সকল ভ্রমণ করিতাম, মধ্যাহ্নে চশমাসাহী কাননে অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রালাপ এবং সৎকথার অলোচনা করিতাম, অপরাহ্নে পরিমলবাহিনী পরিমহলে উপস্থিত হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতাম। ফলতঃ যে আনন্দ এই ৯ দিন এখানে উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্য নহে।

পরিমহল বা নিষাদপুর।

চশমাসাহীর দক্ষিণ প্রান্তের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র শিখর আছে, এখান হইতে সমস্ত হ্রদের সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর রূপে পরিলক্ষিত হয়; এবং এখানকার বায়ু পরিমল-বাহী বলিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রমোদ-বিলাস প্রমত্ত মন প্রমোদিত হইয়া উঠে। সেই জন্য নাকি এখানে সমস্ত কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া রাজ্ঞী নুরজাহানকে, তারকা-মধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজিত রাখিয়া পরিমহল নামে এই সপ্ততল-বিশিষ্ট পরম রমণীয় হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে একটী

রমণীয় উৎস প্রবাহিত হইয়া ইহার মধ্য দিয়া জল-প্রপাতের ন্যায় এক তল হইতে অন্য তলে পতিত হইতে হইতে নিম্নতলে গমন করিত। সেখানে একটী স্নানাগার ছিল, তাহা জলপূর্ণ হইয়া শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া যখন একধারে ঝর্ ঝর করিয়া পতিত হইত, তখনকার শোভা যে কি রমণীয়, যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহা কদাচ বুঝিতে পারিবেন না। মহল এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে, ইহার উপরিস্থ অট্টালিকা সকল কালের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, এরূপ রমণীয় অট্টালিকা তৎকালে পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল কিনা সন্দেহ। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে নিষাদগণ এই স্থানে বাস করিত এবং এই স্থানের নাম নিষাদপুর ছিল, এখান হইতে সেই নিষাদেরা কাশ্মীরের সমতল ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিত; প্রাচীন কালের ভূপতিরা দস্যু তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা পাই-বার নিমিত্ত নিষাদ রাজের শরণাপন্ন হইতেন, এবং তাহারাও সময়ে সময়ে অসীম বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভিন্ন জাতীয় দস্যুদিগের হস্ত হইতে কাশ্মীর রাজ্য রক্ষা করিয়া আর্য্য নর-পতিদিগের স্নেহ ভাজন হইত। আজি সে পরিমহল অরণ্যে সমাকীর্ণ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস স্থান, একা তদুপরি ভ্রমণ করা দুঃসাহসের কর্ম্ম। সংসারে এ প্রকার বিচিত্রতা দেখিয়া মহা ভাগ্যবানগণ ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়া থাকেন, যে পথের পরি-ণাম কোন কালেই এরূপে পরিণত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য।

আমাদের অমরনাথ যাত্রার দিন এখনও সমাগত হয় নাই, এই হেতু এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিবার প্রচুর সময় থাকায় আমরা কাশ্মীরের অন্যান্য দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় হিমালয় পর্য্যটকেরা লিখিয়াছেন, কাশ্মীরে প্রায় এক শতেরও অধিক সংখ্যক পৌরাণিক কীর্ত্তি চিহ্ন আছে। কোন্ কালে যে তৎসমুদয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা যখন এ দেশে আসেন, তখন যে তাঁহারা ইহার অধিকাংশ নির্ম্মাণ করিয়া যান, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে বনিহালের মন্দির, শঙ্করাচার্য্যের মঠ, হরিপর্ব্বতের মন্দির এবং মার্ত্তণ্ডে সূর্য্য-দেবের মন্দির সর্ব্ব প্রধান। এ সকল বিষয়ের সংক্ষেপ বর্ণন প্রস্তাবান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্যের কতক-গুলি বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

বরাহ মূলা।

শাস্ত্রে কথিত আছে, যৎকালে ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, তৎকালে এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। তখন দেবতারা আসিয়া তাঁহার স্তব ও স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানে সেই কাল হইতে কোটীশ্বর নামে এক সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

রহিয়াছেন। লিঙ্গের উর্দ্ধভাগে পাঁচটী মুখ আছে, তাহার গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এবং আর্য্য জাতি কতদূর কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। এই মহাদেবের পাদদেশে আসিয়া বিতস্তা বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার পর অতি সংকীর্ণ ভাবে গিরিকন্দর পর্য্যটন করিতে করিতে দূরে কৃষ্ণগঙ্গার সহিত একাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে চন্দ্রভাগা নামে পরিচিত হওতঃ সিন্ধু সলিলে মিলিত হইয়াছেন। এই সঙ্গমস্থল অতি রমণীয়, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে প্রশস্ত ময়দান, তাহার মধ্য দিয়া বিতস্তা এবং কৃষ্ণগঙ্গা যেন হাত ধরা-ধরি করিয়া সখির ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছেন, যাঁহারা প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ সঙ্গমের ভাব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। কৃষ্ণগঙ্গার জল যেমন কৃষ্ণবর্ণ, বিতস্তার জল তেমনি শুভ্র, যখন এই দুই বর্ণ মিলিয়া এক পথে গমন করিতেছে, তখন তাহার শোভা দেখিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, আর ভাবুকদিগের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হয়, যেন কালী আর কৈলাসবাসিনী গঙ্গা একাঙ্গ হইয়া উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করতঃ কৈলাস হইতে অবতরণ করিতেছেন।

বৈর-নাগ।

অচ্ছোদ সরোবর হইতে প্রায় ৩২ মাইল উত্তর দক্ষিণে সাহা-বাদ উপত্যকায় স্থিত। এখানে একটী সুপ্রশস্ত উৎস আছে, ইহা কাশ্মীরের সমস্ত উৎস অপেক্ষা বৃহৎ ও অতি রমণীয়। ইহাকে উৎস না বলিয়া প্রকৃত জলাশয় নাম দিলেও অত্যুক্তি

দোষে দূষিত হইতে হয় না। একটী পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে এই জলাশয়রূপী উৎস অতি গভীর শব্দ করিতে করিতে নির্গত হইতেছে, জলাশয়টী অষ্টকোণ বিশিষ্ট, প্রায় ১১০ ফিট প্রশস্ত এবং ৫০ ফিট গভীর, ইহার চতুঃপার্শ্বে ৬ ফিট প্রশস্ত পথ এবং প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে এই প্রাচীরের উপরিভাগে পরম রমণীয় অট্টালিকা ছিল। কথিত আছে, এই স্থান হইতে বিতস্তার উৎপত্তি হইয়াছে। ১১ ফিট প্রশস্ত ও ন্যূনাধিক ৩ ফিট গভীর পাষাণ নির্ম্মিত এক প্রণালী দ্বারা এই জল অনর্গল প্রবল বেগে বহির্গত হইতেছে, তথাপি জলাশয়ের জল কিছুমাত্র হ্রাস হইতেছে না। কথিত আছে, ইহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান জাহাঙ্গীরের চিত্তাকর্ষণ করেন, তাহার পর হইতেই দিল্লীশ্বরেরা এখানে নানাবিধ রমণীয় প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রণালীর বহির্দ্বারের বাম ভাগস্থ প্রাচীরে পারস্য ভাষায় একটী কবিতা খোদিত রহিয়াছে, তাহার ভাবার্থ এইরূপ—"ঈশ্বরানুগৃহীত সার্ব্বভৌম সম্রাট হায়দার শাহেজানের আদেশানুসারে এই প্রণালী নির্ম্মিত হইল, ইহার স্বর্গীয় প্রবাহ জলধারা রূপে সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকিয়া সংসারকে বিশুদ্ধ করিবে, এবং তদ্দ্বারা কাশ্মীরের গৌরব চিরদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

অন্যান্য সকল সম্রাট অপেক্ষা জাহাঙ্গীর সাহের এই স্থানটী অতি প্রীতিকর ছিল। তাঁহার জীবনী লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন, একদা কাশ্মীর গমন কালে পথিমধ্যে "বরম্‌-গোলায়" তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হয়, মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া

তিনি কহিয়াছিলেন, "যাহাতে জীবদ্দশায় প্রিয় বিলাস ভবন "বৈর-নাগে" পৌছিতে পারি, তাহার আয়োজন কর। পরক্ষণেই কহিলেন, "যদি কৃতান্ত একান্ত সে সাধ পুরাইতে না দেয়, তাহা হইলে যেন আমার মৃত দেহ এই প্রিয়তম স্থানেই সমাধিস্থ হয়।"

উলর হ্রদ।

কাশ্মীর প্রদেশে যত হ্রদ আছে, তাহার মধ্যে এই হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। শ্রীনগর হইতে বিতস্তা ক্রমে কলেবর বিস্তারিত করিয়া এই হ্রদের মধ্য দিয়া সোপাব, শিবপুর প্রভৃতি জনস্থলী অতিক্রম করিয়া কোটীশ্বর মহাদেবের চরণ ধৌত করিবার নিমিত্ত বরাহমূলায় উপনীত হইয়াছে। শ্রীনগর হইতে নৌকা পথে এই হ্রদে পৌছিতে প্রায় ১০।১২ ঘণ্টা লাগে। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ মাইল, প্রস্থ প্রায় ১০ মাইল, স্থানে স্থানে গভীরতা প্রায় ১৭।১৮ ফিটেরও অধিক। এই শ্যামবর্ণ শোভা সম্পন্ন গভীর জলাশয়ের শোভা দেখিলে চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। এত উচ্চ পর্ব্বতের উপর এই জল রাশি কোথা হইতে আসিল ভাবিলে, সেই অগাধ প্রেমনিধি পরমেশ্বরের অপার লীলা ও অসীম শক্তি স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মধ্য হইতে সহস্র সহস্র উৎস বহির্গত হইয়া ইহার কলেবর এত বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ব্যতীত চতুষ্পার্শ্বস্থ গিরিমালা হইতে অনবরত বারি-ধারাও পতিত হইতেছে।

ইহাতে অনেক জলজ লতা উৎপন্ন হয়। পানিফল, মৃণাল এবং কমলের অনেক বন আছে। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যুচ্চ

পর্ব্বত শ্রেণীতে সমাকীর্ণ, তাহার পাদদেশে রমণীয় উপবন সর্ব্বক্ষণ ফুলফলে সুশোভিত, তাহাতে নানা বর্ণের পক্ষী আছে, এবং তটের চতুর্দ্দিকে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার লোকেরা ইহার মৎস্য এবং নানাবিধ জলোৎপন্ন ফল আহরণ করিয়া, ও নানাবিধ পক্ষী শিকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হ্রদের জল অতি প্রশস্ত বলিয়া অতি অল্প বাতাসেই তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এজন্য অপরাহ্নে ইহাতে ভ্রমণ করা অতি দুঃসাধ্য, কারণ তৎকালে মন্দ মন্দ মারুতে উহার বেগ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, তখনকার সে ভাব দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

এই হ্রদ প্রায় ৫১০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর। এক কূলে দাঁড়াইলে অন্য কূল দৃষ্ট হয় না। সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতে অতি রমণীয়। নৌকাযোগে ইহার মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, বোধ হয়, যেন এই জল রাশি হইতে সূর্য্য উদিত হইয়া অপর প্রান্তে অস্তমিত হইতেছেন। দূরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী মস্তকোত্তোলন করিয়া যেন তাঁহার স্তব স্তুতি করিতেছে, এই হ্রদের অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং তরঙ্গমালার নৃত্য দেখিতে বহুদূর হইতে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণও প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া থাকেন।

পামপুর এবং কেশর বা জাফরাণ ক্ষেত্র।—

৩০ শে জুলাই সন্ধ্যার সময় নৌকাযোগে আমরা অমরনাথ যাত্রা করি। পর দিন প্রাতে পামপুরে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করি। এখানে আসিয়া দেখিলাম জাফরাণ ক্ষেত্রের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কৌতূহল পরবশ হইয়া জাফরাণ ক্ষেত্র

দর্শন করিবার নিমিত্ত তীরে উঠিয়া প্রায় ৪ মাইল পথ পদব্রজে গমন করি এবং জাফরাণ ক্ষেত্রের কার্য্য নিচয় পরিদর্শন করি; তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাফরাণ কাশ্মীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহা কাশ্মীরের সর্ব্ব স্থানে উৎপন্ন হয় না, শ্রীনগরের পূর্ব্ব প্রায় ৮।১০ মাইল দূরে পামপুর নামক প্রান্তরে ইহা কেবল উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকা পথে গমন করিলে প্রায় ৮।১০ ঘণ্টায় (উজান বলিয়া) এস্থানে পৌঁছান যায়। প্রান্তরটী প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ এবং ২½ মাইল প্রশস্ত, বিতস্তার তীর হইতে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার দৃশ্য দেখিতে অতি রমণীয়, উত্তরে অত্যুচ্চ গিরিমালা, পশ্চিমে শঙ্করাচার্য্যের শোভনতম সুন্দর শৃঙ্গ শ্রীনগরের সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখিয়া যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পূর্ব্বসীমায় বুদ্ধবিহারের বৃহৎ স্তুপ যেন পামপুরের সৌন্দর্য্য দেখিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে, দক্ষিণে বিতস্তা পশ্চিমবাহিনী থাকিয়া খরতর বেগে প্রবাহিতা; ইহার মধ্যস্থ এই সুবৃহৎ ক্ষেত্রেই জগদ্বিখ্যাত কেশর বা জাফরাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রায় ১১০০ বৎসর অতীত হইল পদ্মনাভ নামে এক ধার্ম্মিক রাজা এখানে বাস করিতেন, তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পামপুর নামক জনপদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পদ্মনাভ হইতে পদ্মপুর, এবং পশ্চাৎ তাহাই পামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্ম্মসৌরভ অদ্যাপি জাফরাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাফরাণ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগের অতি প্রিয় বস্তু। তাঁহারা ইহাকে

"কাশ্মীরজ" বলিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর অতি যত্নে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ইহার পুষ্পে তাঁহাদের ইষ্টদেব তুষ্ট হন, এই জন্য জাফরাণ পুষ্প চন্দনের ন্যায় ঘর্ষণ করিয়া স্ত্রী পুরুষে তাহার তিলক ধারণ করেন। জাফরাণের যেমন সৌন্দর্য্য তেমনি সদ্গন্ধ, সে জন্য মুসলমান সম্রাটেরা ইহা পলান্নে ব্যবহার করিতেন। আজি কালি পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে ইহা এইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রঙ্ করিবার জন্য এবং অনেক প্রকার রোগের ঔষধের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের আলুর চাষের ন্যায় ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বীজ দেখিতে ঠিক পেয়াজ রসুনের মত, ইহার বপন কার্য্য অতি সহজ। ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বীজগুলি মাটীতে মিশাইয়া দিলেই যথাসময়ে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। কথিত আছে সৃষ্টিকাল হইতে ইহা এইরূপে চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানেরা কহেন তাঁহাদের প্যাগম্বর এ বীজ স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত হন, হিন্দুরা কহেন, মহাভাগ পদ্মনাভ শারীকা দেবীকে প্রসন্ন করিয়া এই বীজ নন্দন কানন হইতে প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক ইহা যে প্রকৃতি দেবীর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাহার আর সন্দেহ নাই। আরও কথিত আছে যে, এক একটী বীজের উৎপাদিকা শক্তি ১৬।১৭ বৎসর পর্য্যন্ত সমান থাকে, তাহার পর উহা হইতে আর একটী বীজ উৎপন্ন হয়। অঙ্কুর উদ্গত হইবার পূর্ব্বে উহা হইতে অগ্রে একটী সুন্দর পুষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটী বীজ হইতে চারিটীর অধিক অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, অঙ্কুর সমুদয় ৫ বা ৬ ইঞ্চ ঊর্দ্ধ হয়, মূল হইতে যে তৃণ

জন্মে তাহাও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কালে ঐরূপ উন্নত হয়, সুতরাং দেখিতে অতি সুন্দর। পুষ্প গুলি ষষ্ঠদল বিশিষ্ট, ঈষৎ নীলবর্ণ, প্রত্যেক পুষ্পে ছয়টী করিয়া কেশর উৎপন্ন হয়, তাহার তিনটী গাঢ় রক্তিমাবর্ণ, অপর তিনটী পীতবর্ণ, রক্তিমা বর্ণ কেশরই প্রকৃত জাফরাণ। কেশর চর্ব্বণ করিলে রমণীয় গন্ধ উদ্গত হয়। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা ঐ তিনটী লালবর্ণ কেশরকে ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর কহেন, এবং নিম্নস্থ ষড় দলকে তাঁহাদের সিংহাসন বলিয়া কল্পনা করেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে পুষ্প বিকসিত হইতে থাকে, পুষ্প সংগৃহীত হইলে ৩।৪ দিবসে আবার নূতন পুষ্প উদ্গত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক অঙ্কুর হইতে ৪ বা ৫ বার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া প্রায় ৪ সপ্তাহের মধ্যে পুষ্পোদ্গমন শেষ হইয়া যায়। যখন পামপুরের সমস্ত প্রান্তর প্রস্ফুটিত কেশর কুসুমে পরিশোভিত হয়, তখনকার শোভা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই মনোহর লোহিত, পীতবর্ণ শোভায় দিক আলোকিত করিয়া তুলে। পুষ্প গুলি হস্ত দিয়া ঝাড়িলেই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, লোহিত ও পীত কেশরকে স্বতন্ত্র করিতে হইলে জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে লোহিত বর্ণ কেশর গুলি নিম্নে নিমজ্জিত হয় এবং বাসন্তি পাপড়ি গুলি উপরে ভাসিতে থাকে, তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। ফুল গুলি তুলিয়া লইলে তৃণ বাড়িতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ফুল ফুটিবার সময় তৃণ অঙ্কুর অপেক্ষা উন্নত হয় না, কিন্তু পুষ্প বিকসিত হইয়া গেলেই উহা

বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। এই তৃণেরও এক আশ্চর্য্য গুণ আছে, গাভীগণ ইহা ভক্ষণ করিয়া যে দুগ্ধ দেয়, তাহাতে ও জাফ্‌রাণের সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে এবং এই দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট নবনীত ও ঘৃত প্রস্তুত হয়, সেই জন্য পামপুরের দুগ্ধ, নবনীত ও ঘৃত এমন সুস্বাদু হয় যে, সমস্ত কাশ্মীরে কুত্রাপি সেরূপ হয় না। আরও আশ্চর্য্য এই, কেশর ক্ষেত্রের নিকটস্থ ভূমিতে যে সকল ফল ফুল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অন্য স্থানাপেক্ষা অধিকতর রসাল, মিষ্ট, ও সুস্বাদু।

বীজ রোপিত হইলে আমাদের দেশে পুষ্পিত হয় কি না পরীক্ষার নিমিত্ত পামপুর ক্ষেত্রের মাটী এবং কতক গুলি বীজ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত খাঁটরা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারস্থ শ্রীমান্ রাসবিহারি দত্তের নিকট পাঠান হইয়াছে, পূজার পর (কার্ত্তিক মাসে) তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, একটী বীজ হইতে লোহিত বর্ণের একটী কেশর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই অনুভব করা যাইতে পারে যত্ন করিলে আমাদের দেশে কেশর উৎপন্ন হইতে পারে।

মানস সরোবর।

উলর হ্রদের প্রায় ১০০০ ফিট্ উচ্চে উত্তর হিমালয়ের ঠিক পাদমূলে স্থিত, শ্রীনগর হইতে নৌকাযোগে এক দিনে এখানে পৌঁছান যায়।

ইহাকে কাশ্মীরী ভাষায় "মানসবল" কহে। ইহা এরূপ রম্য যে, দেখিলেই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, আর কেহ না বলিয়া দিলেও আমাদের সেই শাস্ত্রোক্ত মানস সরোবর বলিয়া

বোধ হয়। কাশ্মীরে ভ্রমণ করিয়া অমরা যত হ্রদ দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যে ও গভীরতায় ইহা সর্ব্ব প্রধান। আমরা প্রায় সমস্ত দিন এই হ্রদের কূলে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, আমাদের সহযাত্রী স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী ইহার শোভা দেখিয়া বিমোহিত-প্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এই স্থানেই আমরা অবস্থিতি করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করি, কিন্তু আমাদের মন তখন বিশ্ব শোভায় বিমোহিত, এক স্থানে দীর্ঘ কাল স্থির থাকিবে কেন? তাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য এত ব্যকুলতা। বস্তুতঃ ভগবান্ কোথায় যে কত অপূর্ব্ব রত্ন সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যেখানে যাই সেখানেই তিনি মোহন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীব জগতকে কখন হাঁসাইতেছেন, কখন কাঁদাইতেছেন, তাই স্বরূপানন্দকে বুঝাইতে ছিলাম যে, যাঁহার প্রেমের ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার কি একটী দ্বার, তাই সেইখানেই পড়িয়া থাকিবেন? চলুন যাই তাঁহার বিশ্ব নিকেতনে, আরও না জানি সেখানে তাঁহার কত অপূর্ব্ব মহিমা দর্শন করিব, এক স্থানে আবদ্ধ কেন থাকিব?

সরোবরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ১½ মাইল হইবে। কোন কোন স্থল এত গভীর যে, তথায় যাইতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, স্থানে স্থানে ইহার গভীরতা ১৫০ ফিট হইতেও অধিক, ইহার তিন পার্শ্ব গগনভেদী পর্ব্বত শ্রেণীতে সমাকীর্ণ, তাহার উত্তর শৃঙ্গ হইতে অমরাবতী গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া ধব্ ধব্ শব্দে মানস সরোবরে আসিয়া পড়িতেছেন। তাহার

অনতিদূরে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা ছোট ছোট তাম্বু লাগাইয়া আনন্দে অবস্থিতি করিতেছেন। জল এত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল যে, বহুদূরের নিম্নস্থ পদার্থ স্পষ্ট লক্ষিত হয়, বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য নীলবর্ণ গভীর জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, ইহার চারি ধারে এবং জল মধ্যে অসংখ্য উৎস আছে, তাহাতেই ইহার জল কোন কালে শুষ্ক হয় না, বিতস্তার একটী প্রণালী দিয়া হ্রদে প্রবিষ্ট হইতে হয়, এই প্রবেশ দ্বার অতি প্রশস্ত, দুই দিকের পাহাড় যেন দ্বারের পথ রাখিয়া উর্দ্ধগামী হইয়াছে, ইহার উপরের কোন একটী শৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া দেখ, মানস সরোবরের চতুর্দ্দিকের শোভায় দিক আলো করিয়া রহিয়াছে। উচ্চে মেঘমালা পরিবৃত উচ্চ পর্ব্বত, তাহার মধ্যদেশে সুরম্য উপবন নানাবিধ ফুল ফলে বিভূষিত রহিয়াছে, পদ-প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম যেন নানা রূপের ডালি সাজাইয়া রহিয়াছে, তন্নিম্নে মানস সরোবরের সুবৃহৎ হ্রদ, সে হ্রদের চতুঃপার্শ্ব পদ্মবনে পরিপূর্ণ, তাহাতে শ্বেত ও রক্তিম বর্ণের সুবৃহৎ অসংখ্য পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে গভীর নীলবর্ণ জলরাশি স্থির ভাবে রহিয়াছে, দেখিলে সে শোভায় বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-জীবী মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পুরাকালে দেব ও গন্ধর্ব্বের মন বিমোহিত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরও এখানে কয়েকটী প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অমরাবতী গঙ্গার অনতিদূরে একজন মুসলমান সাধুর আশ্রম আছে, প্রায় তিন মাস গত হইল, সাধু নিজ যত্নকৃত নশ্বর আশ্রম

পরিত্যাগ করিয়া, অসীম অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কতিপয় শিষ্যেরা আশ্রমটী এখন রক্ষা করিতেছেন, সেই আশ্রমস্থ ফুল ফল অতি রমণীয় ও বৃহৎ, সকল ফলাপেক্ষা পিচ ফল অতি বৃহৎ, সুমিষ্ট ও রসাল, তেমন সুস্বাদু ফল কাশ্মীরের কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই আশ্রমের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, ঐ গহ্বরটী ঐ আশ্রমস্থ সাধু নিজ হস্তে প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া খনন করেন। প্রবেশ দ্বার হইতে অন্ত পর্য্যন্ত গুহাটী প্রায় ১০০ হস্ত দীর্ঘ ৬ ফীট হইতে ৮ ফীট্ উচ্চ, পরিসর সর্ব্ব স্থানে সমান নহে। সুড়ঙ্গের আকারে সঙ্কীর্ণ পথ হইতে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মধ্যস্থলে মন্দিরের আকার ধারণ করিয়াছে। গুহাটী তিন ভাগে বিভক্ত,—প্রথম সঙ্কীর্ণ সোপান সদৃশ, তৎ-পশ্চাৎ আগন্তুকদিগের বসিবার প্রশস্ত স্থান, তদনন্তর সমাধি স্থান। স্থানটী অতি পবিত্র ও রমণীয় বলিয়া বোধ হইল, সামান্য শব্দ করিলে তাহার প্রতি-ধ্বনিতে গুহাভ্যন্তরস্থ আকাশ গরজিয়া উঠে। সুতরাং কথা কহিবার ইচ্ছা করে না। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই ধ্যানস্থ হইতে অভিলাষ হয়, আমরা এখানে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলাম, এবং তাহাতে অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ স্থানটী সকল প্রকারেই রমণীয়, প্রকৃতিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বক্ষণ এ স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে, এমন রমণীয় স্থানে এক জনও হিন্দু সাধু দৃষ্ট হইল না।

ক্ষীর ভবানী।

১০ই জুন আমরা বরাহ মূলা পরিত্যাগ করিয়া নৌকা পথে শ্রীনগর যাত্রা করি, পথে স্থানে স্থানে লুচি কচুরি খওয়ায় আমাদের শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ১১ই জুন রাত্রে শিবপুর পৌছিয়া আমার গাত্র দাহ হইয়া জ্বর ভাবের লক্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল। সে অবস্থা দেখিয়া মাঝিরা কহিল, কাল ক্ষীর ভবানীর মেলা, তথায় গিয়া স্নান করিলে ও জ্বর সারিয়া যাইবে। এ দেশের লোক লুচি কচুরি কি রুটি অধিক খায় না; বাঙ্গালীর মত দুই বেলা ভাত খাইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার জল বায়ুর দেশে বিপরীত আচরণ করায় আমার যে জ্বর ভাব হইয়াছে তাহারা তাহাই বুঝাইয়া দিল, এবং কহিল যে ক্ষীর গঙ্গার জল এত মধুর ও স্বাস্থ্যকর যে, সে জলে স্নান এবং সে জল পান করিলে ওরূপ জ্বর সহজেই চলিয়া যাইবে। আমাদের দেশের কালীঘাটের ন্যায় কাশ্মীরের ক্ষীর ভবানী জাগ্রত ও মাননীয়া। এ জন্য প্রতি বৎসর এই সময়ে এই স্থানে এক মহা মেলার আয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই মেলা দেখিবার নিমিত্ত আমরা আরও উৎসাহিত হইয়া সমস্ত রাত্রি নৌকা চালাইয়া ১২ই জুন প্রাতে ক্ষীর ভবানীতে পৌছিলাম। সুতরাং বরাহ মূলা হইতে ইহা ঠিক দুই দিনের পথ। শিবপুর হইতে বিতস্তা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ একটী প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। স্থানটী দ্বীপের আকারে পরিণত, চতুর্দ্দিকে জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে, স্থলে বৃহৎ বৃহৎ অনেক গুলি চেনার বৃক্ষ গগন

ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখার ছায়ায় স্থানটী মন্দিরের আকারে পরিণত হইয়াছে। তাহার উত্তর পূর্ব্ব ভাগে কয়েক খান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, কিন্তু নৌকা ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার কোন উপায় দৃষ্ট হইল না। কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের কুলদেবী ক্ষীর ভবানী এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন, প্রতি বৎসর এখানে তাই সমারোহের সহিত এই সময়ে এক মহামেলা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বারুণীর স্নানের ন্যায় প্রায় সমস্ত কাশ্মীর প্রদেশ হইতে হিন্দুরা এই স্থানে স্নান ও পূজা করিতে আসিয়া থাকেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি দ্বীপটি লোকে পূর্ণ হইয়াছে, চতুর্দ্দিক যাত্রীদিগের শত শত সুসজ্জিত নৌকা আগুলিয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে আমাদের নৌকা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমার শরীর তাপজ্বরে হুলস্থূল করিতেছিল, ক্ষীর ভবানীর ঘাটে স্নান করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত তাপ কোথায় চলিয়া গেল। শরীর বেশ সবল ও সুস্থ হইল, তাহার পর নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দে তীরে উঠিয়া দেবীর দর্শন লাভ করিবার নিমিত্ত সবান্ধবে যাত্রা করিলাম। কিন্তু সে পথ অতিক্রম করা কঠিন হইয়া উঠিল, দ্বীপের সমস্ত ধারে যাত্রীরা মল মূত্র ত্যাগ করিয়া বারপর নাই কদর্য্য ও দুর্গন্ধময় করিয়া রাখিয়াছে, দেখিলাম আমাদের সম্মুখে কত স্ত্রী পুরুষ ইতস্ততঃ উপবিষ্ট হইয়া মল ত্যাগ করিতেছে, নিকটে উলঙ্গ হইয়া জলে স্নান করিতেছে,সে ভাব দেখিয়া আমাদের শরীর ঘৃণায় আকুল হইয়া উঠিল, এই বিষ্ঠা মূত্র পূর্ণ ক্ষেত্রের পরেই আপম শ্রেণী

তথায় নানাবিধ পক্কান্ন প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইতেছে, তাহার পর প্রান্তে ব্রাহ্মণদিগের পূজার স্থান, উর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া (ভিতরে কৌপীন মাত্র উপরে পট্যুর এক একটী ফারণ আপাদ-মস্তক লম্বিত কাবার মত জামা) চন্দন কেশরে সুশোভিত হইয়া কেহ ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছেন, কেহ দুর্গার স্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ পূজা করাইবার নিমিত্ত যাত্রী-দিগকে আহ্বান করিতেছেন কেহ হস্তোত্তোলন করিয়া আশী-র্ব্বাদ করিতে করিতে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিতেছেন; আমরা তাহা দেখিতে দেখিতে এই লোকারণ্যের মধ্য দিয়া ক্ষীর ভবানীর দর্শন লাভার্থ যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম এখানে কোন রূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড, কুণ্ডটী প্রায় ২০।২২ ফিট্ দীর্ঘ, ৮।৯ ফিট্ প্রস্থ এবং প্রায় ৫।৬ ফিট্ গভীর হইবে, তাহার মধ্যস্থলে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মঞ্চ আছে, তাহাতে সংলগ্ন কতকগুলি ধ্বজ-পতাকা, তাহার নিশান ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে, তাহার আপাদ মস্তক পুষ্প-মালায় সুশোভিত—ইহাই ক্ষীরভবানীদেবী। যাত্রিগণ এই কুণ্ডে ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে, ক্ষীর, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চন্দন, সিন্দুর এবং নানাবিধ পুষ্প দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন এবং কুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য ঘৃতের দীপ ও ধুপ ধুনা জ্বালাইয়া হোম করিতেছেন। পাণ্ডারা কুণ্ডটি পরিক্রম করিতে করিতে মধুর স্বরে দেবীর স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে দর্শকদিগের কপালে ফোটা লাগাইয়া প্রচুর দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছেন। সময়ে সময়ে এত সামগ্রী (ঘৃত, মধু, ক্ষীর, দুগ্ধ, সিন্দুর, চন্দন, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস, আঙ্গুর প্রভৃতি) কুণ্ডে পতিত হইতেছে

যে, কুণ্ডের জল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিকৃত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং সময়ে সময়ে পাণ্ডারা তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছেন, পরক্ষণেই নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইয়া কুণ্ডটী পূর্ণ হইতেছে, অনুমান হয় নিম্নে পয়প্রণালী আছে, তাহার দ্বারা জলের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। কিম্বদন্তী এই যে, এই কুণ্ডের জল নিয়ত বর্ণ পরিবর্ত্তন করে, কোন কোন সময়ে দিবা রাত্রির মধ্যে গোলাপী, সবুজী, নীল এবং রক্তিমা বর্ণে পরিণত হয়, আবার কখন কখন দীর্ঘ কাল এক বর্ণই থাকে। যে সময়ে দেবী কুপিতা হন, তখন কুণ্ডের জল রক্তিমাবর্ণে পরিণত হয়, তাহাতে লোকে রাজ্যে অমঙ্গলের আশঙ্কা করে, আমরা এখানে দুই দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, প্রথমে কুণ্ডের জল গাঢ় নীল বর্ণে পূর্ণ ছিল, সন্ধ্যার সময় সেই জল সম্পূর্ণ গোলাপী বর্ণে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুষ্পরাশি সমাকীর্ণ (অবশ্য নীল, পীত, লোহিত বর্ণের) ঘৃত, সিন্দুর মধুসিক্ত জল যে কি প্রকারে এক বর্ণে পরিণত হয়, তাহার কারণ বুঝা যায় না। এই পবিত্র কুণ্ড তীর্থের ধারে বসিয়া আমরা প্রাতঃ-সন্ধ্যা পূজা অর্চ্চনা করিয়াছি, তাহাতে যে অনুপম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। কাশ্মীরে পৌঁছিয়া এ দেশের মেলা এই প্রথম দর্শন করি, কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা সপরিবারে এখানে আসিয়া থাকেন, রমণী এবং বালক বালিকাদিগের বেশ ভূষায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে, সুতরাং সে রূপের ডালিতে চাকচিক্যময় জরি বসনের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হইয়াছে, তাহার উপর তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত থাকায় এবং মস্তকে

শুভ্র বর্ণের গোলাকার টুপি মটুকের ন্যায় শোভমান হওয়ায় এক অপূর্ব্ব দেশের এক অপূর্ব্ব জীব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমাদের নৌকার উভয় পার্শ্বে কয়েক জন ভদ্র পরিবার নৌকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের সহিত বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করেন, দেখিলাম কাশ্মীরী স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা অসীম, পুরুষেরা পূজাপাঠেই ব্যস্ত, স্ত্রীলোকেরা আমাদিগের সহিত নির্ভীক চিত্তে কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন, এবং চা পান করিবার নিমিত্ত বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছিলেন। এরূপ প্রকারের চা আমরা পূর্ব্বে কখন পান করি নাই, খাইতে যেমন মধুর, তাহার গুণও তেমনি আশু সুফল-প্রসূ, এক পেয়ালা চা পান করিলে দশ মিনিটের মধ্যে শরীর বিলক্ষণ উষ্ণ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ইহাদিগের সাধুভাবে আমরা যথেষ্ট আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা কাশ্মীরী ভাষা জানিতাম না, নচেৎ ইহাদিগের মনের ভাব ও কার্য্যের গতি এই অবসরে অনেক শিক্ষা করিতে পারিতাম। ইহাঁরা অতি নম্র ও বিনীত স্বভাব এবং সম্পূর্ণ অতিথিপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। আমরা লাহোর হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং নিম্ন প্রদেশস্থ অনেক উচ্চ পদস্থ পণ্ডিতের নাম করিয়া কহিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয়। ক্ষীর ভবানীর নিকটস্থ গ্রাম সকল অতি সামান্য, জল টুঙ্গির মত মাচা বাঁধিয়া লোকেরা তথায় বাস করে, গৃহ সকল প্রায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত। সিন্দুকের মত, ধূম নির্গমনের জন্য তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী গবাক্ষ আছে, তাহার প্রবেশ

দ্বারও অতি সামান্য ও সংকীর্ণ, কিন্তু সমস্ত গৃহ গুলি দ্বিতল। নিম্নে পশু-শালা ও উপরে তাহাদের বাসস্থান, অধিবাসীরা যার পর নাই মলিন অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ অতি সামান্য। হিন্দু পুরুষে তিলক ধারণ করে, এবং স্ত্রীলোকেরা মস্তকে শুভ্র বর্ণের উষ্ণীষ রাখে, মুসলমান পুরুষের তিলক নাই, স্ত্রীলোকেরা লাল রঙের উষ্ণীষ ধারণ করে এই মাত্র প্রভেদ, নচেৎ আহার ব্যবহারে এবং অবস্থিতিতে উভয় জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ স্পষ্ট ইহাই অনুমিত হয় যে, মুসলমানদিগের সময় যাহারা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারা শাসন ভয়ে সমাজ-চ্যুত হয় নাই, সকলে একত্রে এক গ্রামে, কি এক গৃহে বাস করিত, কালে মুসলমানদিগের প্রতাপ হ্রাস হইলে হিন্দুরাই হউক বা মুসলমানেরা হউক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তাহার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি মুসলমান ভৃত্যেরা হিন্দুদিগের গৃহ কার্য্যের সমস্ত বিষয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, এমন কি পানীয় জল ও প্রস্তুত অন্ন বহন করিয়া লইয়া যায়, আমরা শ্রীনগরে পৌছিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি পণ্ডিতদিগের গৃহে মুসলমান ভৃত্যেরা সমস্ত গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

জটগঙ্গা।

শ্রীনগরের দক্ষিণ প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখর হইতে জটার ন্যায় জটিল ভাবে পরিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রণালী রহিয়াছে। সম্বৎসর কাল তাহা শুষ্ক থাকিয়া প্রতি ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে শিখর ভূমির নানা স্থান হইতে

জল ধারা নিঃসৃত হওত ঐ প্রণালী পরিপূর্ণ করে। তাহার পর দিন উহার জল এক কালে শুষ্ক হইয়া যায়; কিম্বদন্তী এই, এখানে যোগীশ্বর মহাদেব চির বিরাজমান, তাঁহারই জটা হইতে এই জাহ্নবী এক দিন মাত্র প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীরকে প্রতি বৎসর পবিত্র করেন। এই পবিত্র দিনে বহুদূর হইতে লোক সমাগত হইয়া স্নান ও জটগঙ্গার পূজা করে; আশ্চর্য্য এই যে, সম্বৎসর কাল শুষ্ক থাকিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথা হইতে এ জল স্রোত যে প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ অদ্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা ইহাকে গঙ্গোত্রী তীর্থ বলিয়া থাকেন।

ভাসমান দ্বীপ।

জটা গঙ্গার অনতিদূরে একটী জলাশয় আছে, উহাকে লোকে "হাকেসর" কহে। এই জলাশয়ে কয়েকটী সুবৃহৎ ভাসমান দ্বীপ আছে, উহা এরূপ দৃঢ় যে, উহাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, পশুগণ নির্ভয়ে উহার উপর বিচরণ করে, রাখালগণ গরুর পাল লইয়া চারণ করিয়া থাকে। যখন প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন ঐ সকল ভূমিখণ্ড ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করে, দর্শকগণ এই বিচিত্র ভূমিখণ্ডের কৌতুককর ভ্রমণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন।

ত্রিসন্ধ্যা।

শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে একটী কুণ্ড আছে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রতি দিন ঐ কুণ্ডের ৭।৮ স্থান হইতে

নির্ম্মল জলধারা তিন বার মাত্র নিঃসৃত হইয়া কুণ্ডটিকে পূর্ণ করে এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে কয়েক দণ্ড মাত্র পূর্ণ থাকিয়া উহার জল অজ্ঞাত ভাবে কোথায় অপসৃত হইয়া যায়। এইরূপ প্রতি দিন তিনবার হয় বলিয়া উহাকে ত্রিসন্ধ্যা কহে। কাশ্মীরের বহুদূর হইতে এই সময়ে এই ত্রিসন্ধ্যা তীর্থে অনেক লোক আসিয়া স্নান করিয়া পবিত্র হয়।

রুদ্র সন্ধ্যা।

ত্রিসন্ধ্যার পূর্ব্বভাগে আর একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। উহা সর্ব্বদাই শুষ্ক থাকে, কিন্তু সময়ে সময়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে নির্ম্মল জল ধারা প্রবাহিত হইয়া কয়েক দণ্ড মাত্র থাকিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া যায়। কখন কখন ক্রমান্বয়ে কয়েক মাস এই ভাবে চলিতে থাকে, আবার কখন কয়েক দিন মাত্র এই-রূপ থাকিয়া একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, আবার কিয়দ্দিন পরে পূর্ব্বের ন্যায় জলধারা বহিতে থাকে, এক বার জলধারা উৎসারিত হইলে অল্পকাল থাকিয়া এরূপে অন্তর্হিত হইয়া যায় যে,কোন কালে সেখানে জল ছিল বলিয়া বোধই হয় না। তাহার পর আবার জোয়ার ভাঁটার ন্যায় জলস্রোত কখন হ্রাস কখন বৃদ্ধি হইয়া এক অপূর্ব্ব ক্রীড়া করিতে থাকে। গণনা করিয়া দেখা-গিয়াছে যে, ঐইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি দিবা রাত্রে প্রায় ৮।১০ বার হইয়া থাকে। হিন্দুরা ইহার এইরূপ রুদ্র ভাব দর্শন করিয়া ইহাকে রুদ্র-সন্ধ্যা কহিয়া থাকেন, এবং সে জন্য কাশ্মীরী-দিগের ইহা এক মহাতীর্থ স্থান।

সুখাদ্য প্রস্তর খণ্ড।

রুদ্র সন্ধ্যার অনতিদূরে একটী সুবৃহৎ গুহার মধ্যে এক অপূর্ব্ব পদার্থ আছে, উহা খাইতে অতি মধুর ও সুশীতল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বস্তুর ঐ ভাব গুহার মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে, বাহিরে আনিলে উহা কঠিন প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হয়,এবং উহার শীতলতা ও মিষ্টতা লোপ হইয়া যায়। ক্রমাগত বৃষ্টির ধারা পতিত হইয়া কালে গহ্বরের দ্বার দুষ্প্রবেশ্য হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহার অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করা যায় না। প্রবেশ দ্বারে বিস্তর উপলখণ্ড বিস্তারিত রহিয়াছে, লোকে কহিয়া থাকে ইতিপূর্ব্বে যাহারা গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাই উহা বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, কি কারণে গুহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু শীতল ও মধুর হয়, এবং বাহিরে আনিলে কঠিন প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হয়, তাহার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

পিরপাঞ্জালের উভয় পার্শ্বের দুইটী অপূর্ব্ব চশমা।

শ্রীনগরের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে দেব সরোবর নামক সঙ্গমের অনতিদূরে "বাসুকি নাগ" নামক একটী কুণ্ড আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে যখন কাশ্মীরের সমতল ভূমিতে শালী ধান্যের ক্ষেত্র ফলভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তখন এই কুণ্ডটী নির্ম্মল জলে পূর্ণ হয়, শস্য কাটিবার অনতিকাল পরেই কুণ্ডটী এক বারে শুষ্ক হইয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃষকদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্যই যেন কুণ্ডটী পানীয় জলে পূর্ণ করিয়া দেন, শস্য

কর্ত্তন শেষ হইলেই তাহা যেন তথা হইতে স্থানান্তরিত করেন। কারণ তাহাই বটে, কেন না ঐ কুণ্ডের অপর প্রান্তে (অর্থাৎ তাহার দশ ক্রোশ দূরে পির-পঞ্জাল পর্ব্বত শ্রেণীর অপর প্রান্তে) "গোলাপ গড়" নামক আর একটী কুণ্ড আছে, উহার চতুঃপার্শ্বের ভূমি খণ্ড নানা প্রকার শস্যে যখন পূর্ণ থাকে, তখন সেখানেই যে পানীয় জলের বিশেষ প্রয়োজন তাহা সাধন করিবার জন্যই যেন ঐ কুণ্ডটী মিষ্ট জলে পূর্ণ হয়। এইরূপে উভয় পার্শ্বের প্রতি কুণ্ডে ছয় মাস অন্তর জল পূর্ণ হয়। এই দূর ব্যবধানের দুইটী কুণ্ডে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস করিয়া জল পূর্ণ থাকিয়া আবার ছয় মাসের জন্য শুষ্ক হইয়া যায়, ইহার প্রকৃত কারণ অদ্যাপি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, এই কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে যে সুবিশাল পিরপঞ্জাল পর্ব্বত শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিকে শত শত উৎস উৎসারিত ও কত শত প্রণালী অনবরত জল পূর্ণ থাকিয়া বিতস্তার পুষ্টি সাধন করিতেছে।

জলবিন্দু বর্ষক প্রস্তর খণ্ড।

শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্ব গিরিমালার উপত্যকার এক স্থানে একখণ্ড সুবৃহৎ প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে, উহার অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। উহার নিকটে উপস্থিত হইয়া "পানী দেও" "পানী দেও" বলিয়া উচ্চরবে জল ভিক্ষা করিলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে দৃষ্ট হয়, উহার গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই দৃষ্ট হইবে ঐ ঘর্ম্ম-বিন্দু কণায় পরিণত হইয়া বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহার পর

দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ জলবিন্দু সকল পতিত হইতে হইতে সুশীতল জল ধারায় পরিণত হয়, তাহার পর পিপাসু যত ইচ্ছা জল পান করিয়া তৃপ্তি সাধন করে। যে অপার মহিমার সাগর পরমেশ্বর সাহারার মরুভূমিতে সুবৃহৎ তরমুজ ফলের সৃষ্টি করিয়া শত শত জীবের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, তাঁহার কৃপায় বিজন বনে প্রস্তর খণ্ড জল দান করিবে বিচিত্র কি?।

গুলমর্গ।

বিগত ৯ই জুলাই গুলমর্গ হইতে আমার এক স্নেহাস্পদ বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা অবিকল প্রকাশ করিলে এ স্থানের এবং অন্যান্য স্থানের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায় বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ঈশ্বর আমার এ সামান্য জীবনে যে কত সুখ বিতরণ করিতেছেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। গুলমর্গ শ্রীনগর হইতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে পিরপাঞ্জাল পর্ব্বত শ্রেণীর উপর স্থাপিত। সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৮৮০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার চারিদিকের পর্ব্বতমালা বরফে আচ্ছন্ন, মধ্যে বৃহৎ সমতল ক্ষেত্র গ্যালারির ন্যায় গোলাকারে বিস্তৃত, তদুপরি নীল, পীত এবং রক্ত বর্ণের পুষ্প রাশিতে সমাকীর্ণ, এত রকমের এত ফুল একস্থানে কোথাও কখন দেখা যায় না, তাই ইহার নাম "গুলমর্গ" (ফুলের ময়দান হইয়াছে)। এখানে এই সময়ে প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয়, তাই মহারাজা এবং রেসিডেণ্ট শ্রীনগরের বিলাস-ভবন পরিত্যাগ করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন। আমরা আজি

কালি মহারাজার অতিথি, তাঁহার আত্মীয় ও সহচর এবং উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের স্নেহ ও কৃপায় পরমানন্দে এখানে অবস্থিতি করিতেছি। এখানে আজি কালি প্রায় প্রতি দিন ৩।৪ বার বৃষ্টি হইতেছে, শীত যথেষ্ট, সূর্য্যদেব এক এক বার দেখা দিয়া ফুলের বাহার বৃদ্ধি করিতেছেন, জীব সেই অবসরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তাহার সুরে সুর মিলাইয়া আবার কত অপূর্ব্ব রঙের পাখী কত অপূর্ব্ব মধুর স্বরে সুর ভাঁজিয়া গান করিতেছে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। আমরা এখানে ৩ দিন মাত্র থাকিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আজি প্রায় ১৬ দিন অতীত হইল তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এত উচ্চ পর্ব্বতের উপর এমন সুন্দর বাগান প্রকৃতি দেবী স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই কমলা এখানে চিরবিরাজিত। আমাদের দেশের ন্যায় এ ফুল শুকায় না, ঝরে না। (Evergreen) গাঢ় নীল বর্ণের বৃক্ষ সকল শত শত ফিট উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর্ব্বতের যে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তাহা না দেখিলে কথায় বুঝাইতে পারা যায় না। নীলাকাশ উপরে, তাহার নিম্নে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত শ্রেণী গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার নিম্নে গাঢ় নীল বর্ণের কোটী কোটী বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নীল প্রভা বিস্তার করিতেছে। তন্নিম্নে তেমনি নীলময় ক্ষেত্র সকল বিস্তারিত, তাহাদের মধ্য হইতে সর্প গমনের ন্যায় অনতি প্রশস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল হেলিয়া দুলিয়া সমস্ত ভূমিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার কূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকলে অসংখ্য নীল, পীত, লোহিত

বর্ণের পুষ্প রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, ভ্রমণকারী বিলাতি নরনারীগণ যখন তাহার উপর বেড়াইতে বা ক্রীড়া করিতে থাকেন, তখন বোধ হয় স্বর্গ আবার কোথায়? এই ত স্বর্গ, এইত দেবদেবীগণ নন্দন কাননে ভ্রমণ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা যাহার চক্ষু না দেখিয়াছে, তাহার দর্শন সুখলাভ হয় নাই, আবার যে তাহা দেখিয়া একবার সেই পরম কারুণিক বিশ্বপতিকে চিন্তা না করিয়াছে, তাহার জীবন অসার। এখানকার লোক কেমন সরল দেখ, আমরা শ্রীনগর হইতে আসিবার সময় প্রায় ১৫ মাইল পথ জলপথে আসি, মাল্লারা আমাদিগকে দেবতার ন্যায় সেবা করিত, তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ এখানে (নৌকায়) সপরিবারে চিরজীবন বাস করে, (ভিন্ন ঘর বাটী নাই)। আমাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিত, কিসে আমরা পরিতুষ্ট হইব এই তাহাদের বিশেষ চেষ্টা। শ্রীনগর হইতে "পহলান" প্রায় ১৫ মাইল, তাহার নৌকা ভাড়া ॥০ আনা মাত্র, তাহার পর "পহলান" হইতে মহারাজার স্থাপিত ঘোড়ার ডাক; কুলিদের হস্তে সমস্ত জিনিস পত্র সমর্পণ করিয়া আমরা যথাপথে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম, পহলান হইতে ক্রমোর্দ্ধ প্রায় ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলে গুলমর্গে উপনীত হওয়া যায়। পথের দুই ধারে কয়েকটী পয়প্রণালী আছে, তাহার দুই ধারে অসংখ্য মেওয়া ফলের গাছ (সেউ, নেস্পাতি, আঙ্গুর, আকরোট এবং বটঙ্গী প্রভৃতি নানা জাতীয় ফল) সুপক্ক ফলভরে অবনত-মস্তক হইয়া পথিকদিগের তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত আশ্রয় স্থান হইয়া রহিয়াছে। অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও মেওয়া ফলের

বাগান গুলি যেন শান্তির স্থল হইয়া রহিয়াছে। পথে কয়েকটী সুন্দর উপবন দর্শন করিলাম, তাহার রক্ষকেরা সপরিবারে সসজ্জ হইয়া নানাবিধ ফলের ডালী সাজাইয়া পথের ধারে বসিয়া পথিকদিগকে প্রলোভিত করিতেছে। কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিলে তাহাদিগের নিকট হইতে প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্ব্বতের উপত্যকার প্রায় ৬০০০ ফিট উপরে একটী সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত দেব মন্দির আছে, তাহাকে "বাপন্ ঋষির" আশ্রম বলে। কথিত আছে মহাত্মা "বাপন্" দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সম সাময়িক ব্যক্তি, বাদসাহ সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কর-গ্রহণ করিয়া যৎকালে গুলমর্গ রূপ নন্দন কাননে ভ্রমণ মানসে গমন করেন, তৎকালে "বাপন ঋষির" প্রভাব দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন, সেই সময় হইতে এই আশ্রমটী সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়, তাহাতে হিন্দু মুসলমান সমান ভক্তিতে দর্শন করিতে আইসে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দর্শকদিগের আশ্রয় স্থান, সমস্তই কাষ্ঠ নির্ম্মিত, একটী মন্দিরের প্রকোষ্ঠে প্রচুর মৌচাক রহিয়াছে, তাহার মধু যেমন স্বাদু, তেমনি মধুর সদ্গন্ধ বিশিষ্ট, গুলমর্গ রূপ পুষ্পসাগর হইতে বাপনশিষ্য মধুমক্ষিকাগণ মধু আহরণ করিয়া এখানে সঞ্চয় করিতেছে। যাত্রীরা এই মধু পানে প্রেম ও ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া বাপনের আরাধ্য দেবের মহিমা গান করে, স্থানটী প্রাকৃতিক শোভায় পরিশোভিত, সুতরাং অতি রমণীয়। আমরা এখানে অশ্বতরীকে গতক্লম হইতে ছাড়িয়া দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছিলাম, এবং এই শোভাময়ী সুদৃশ্য বিশ্বের রচয়িতার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর

গুণ গান করিতেছিলাম এবং তাহাতে যে সুখানুভব করিতে-ছিলাম, কোন কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না।

মন প্রাণ ধন জন সকলি তোমার,।
তবে আর কি রহিল বলিতে আমার॥
বিশ্ব-শোভা বিশ্বাধারে রমনীয় একাধারে,।
বর্ণনা বর্ণিতে নারে যে শোভা তোমার॥
যে শোভা নয়নে হেরি, হৃদয়েতে চিন্তা করি।,
মরি মরি ওরূপ হেরি রূপেরি আধার॥
স্বার্থক জীবন হ'ল, হেরিয়া শোভা সকল।,
বলিব কি আর বল, আছে বলিবার॥

পথে এইরূপ আর কয়েকটী দেখিবার স্থান দেখিতে দেখিতে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টায়, ঘন হইতে ঘনতর নীল বিজন বন অতিক্রম করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চাকাশে উঠিতে উঠিতে শিখর ভূমিতে আসিয়া উপনীত হইয়া দেখি, আমাদের সমস্ত জিনিস পত্র অতি যত্নের সহিত ইতিপূর্ব্বেই আনীত হইয়াছে, বাসায় ভৃত্যগণ যেন আমাদের ভৃত্য, নিয়ত পরিচর্য্যার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে, এমন কি, আমাদের নিজের ভৃত্যেরা ও তাহাদের নিকট হইতে সমান সেবা পাইতেছে, আহারের আয়োজনও অতি সুন্দর রূপে সংসাধিত হইতেছে। আমরা এখানকার আতিথ্যে সাতি-শয় প্রীত হইয়াছিলাম, সে জন্য মহারাজার এজেন্ট রায় বাহা-দুর জয়কৃষ্ণ বর্ম্মা এবং রেসিডেণ্টের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী বাবু ফতে চন্দ্ তথা ডাক্তার মহম্মদ হোসেন মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ আছি।

গত রাত্রে রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারীর বাসায়

"সনাতন আর্য্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে আমার এক বক্তৃতা হইয়াছিল, সকলেই তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার," ইহাতে কত গম্ভীর তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনী না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। কাশ্মীরের অমূল্য রত্ন "রাজতরঙ্গিণী" (যাহা প্রসিদ্ধ রমেশ চন্দ্র দত্তের ভ্রাতা যোগেশ বাবু, দুই খণ্ডে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা) এখানে আসিয়া পাঠ করিলাম। সেই গ্রন্থ এবং উইলসন সাহেবের "হিমালয়" নামক গ্রন্থ ("Abode of snow" by Mr Wilson) সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে,আমি এখন কি দেখিতেছি, পাঠক কথঞ্চিৎ তাহা অনুভব করিতে পারিবে। প্রতি দিন আমরা প্রাতে ৪।৫ মাইল ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করি, আকাশ নির্ম্মল থাকিলে এখান হইতে দূরস্থ গিরিমালা সকল নয়ন পথে পতিত হয়, প্রায় ১০০ মাইল দূরস্থ ন্যাঙ্গা পর্ব্বত- (উলঙ্গ পর্ব্বত) শিখর উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীল গগন স্পর্শ করিতেছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ন্যাঙ্গা পর্ব্বত প্রায় ২৯০০০ ফিট্ উর্দ্ধ শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন হিমাচলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। তাহার শোভা অতি বিচিত্র. এই বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে ভাবুকের মনে এই ভাবের উদয় হয় যেন, শত শত ধবলাগিরির শিখরোপরি অত্যুন্নত ন্যাঙ্গা পর্ব্বত উদ্‌গ্রীব হইয়া, আর্য্য বংশ কোথায় পলায়ন করিয়াছেন দেখিবার জন্য ভারতের দিকে তাকা- ইতেছে, আবার কোথাও তাহার নাম নিশানা বর্ত্তমান না দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া স্থির বায়ুর সহিত কি, যেন পরা-

মর্শ করিতেছে, ভাবুক! বল দেখি কি ভাবিতেছে? আমার বোধ হয় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গ গমন করিলে পর ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার পর ধর্ম্ম-রক্ষক নরপতিদিগের নাম নিশানা না থাকাতেই আর্য্য ধর্ম্ম, রক্ষক অভাবে, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়, তাই যেন তাহার প্রতিকার মানসে আমাদের চির সুহৃৎ হারাঙ্গা পর্ব্বত, সুবিমল স্থির বায়ুর সহিত পরামর্শ করিয়া আষাঢ়ের বর্ষাকে দূত স্বরূপ পাঠাইয়া ভারতের সুসন্তানদিগকে জাগাইবার নিমিত্ত কল্পনা করিতেছে। তাই বুঝি, তাহার নিম্নদেশে মেঘমালা বপ্রক্রীড়া-প্রবণ গজ যুথের ন্যায় সমাগত হইয়া কে আগে যাইয়া এ সংবাদ দিবে বলিয়া দ্রুতপদ হইতেছে। তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বরূপ তাহার পরেই দেখি বর্ষা বজ্রধ্বনিতে সমাগত হইয়া সমস্ত গুলমর্গ শিখর আচ্ছন্ন করিল। এখন ভরসা হইতেছে, যে এ ধারা ধারাসারে প্রবাহিত হইলে অচিরকাল মধ্যে ভারত প্লাবিত হইবে, তখন সমস্ত দগ্ধ ভূমি আবার রসসিক্ত হইয়া পুনরায় ভারত-ক্ষেত্রকে শস্যশালিনী করিবে, তাহা হইলেই ভারতে আবার বায়ু মধুক্ষরণ করিবে, পবিত্র সিন্ধু-সলিল মধু-স্রাবী হইবে, আকাশ মধুসিক্ত হইবে, দিক্-চতুষ্টয় মধুময় হইবে। তাহা হইলেই জীব আবার মধু সেবন করিয়া মধুময় হইয়া মধুসূদনের মধুর নামে জীবন সার্থক করিয়া জন্ম ~~[illegible]~~ আর্য্য কীর্ত্তি পুন স্থাপনে সমর্থ হইবে। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এই হারাঙ্গা পর্ব্বতকে পৃথিবীর (বিশ্ব সংসারের ভজনালয়) Cathedral কহেন, আমরা উহাকে "হরমুখ" পর্ব্বত বলিয়া থাকি। ঐ "হরমুখ" পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলে হিমালয়ের

অপর প্রান্তে—উত্তর কুরুবর্ষে উপনীত হওয়া যায়, যেখান হইতে আর্য্যেরা বহুকাল হইল ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করি, সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া সৎ-কথায় রাত্রি প্রায় ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত যাপন করি, প্রত্যূষে উঠিয়া নিয়মিত যোগাভ্যাস করিয়া থাকি, এইরূপে আমরা সকলেই ঈশ্বরকৃপায় পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছি। এখন শ্রাবণের পূর্ণিমায় "অমরনাথ" দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পাঞ্জাবে প্রত্যাগমন করিব; অন্য দেশে (উত্তরাখণ্ডে) এবার যাওয়া হইবে না, ক্রমে গিরিসঙ্কট দুর্গম হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং এবার লাদাক্ এবং লাসা দর্শন হইবে না। রাবণপিণ্ডী হইতে ক্রমাগত পাহাড়ী পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ৯০০০ ফিট্ উচ্চ, মরি পাহাড়ে আমরা উপস্থিত হই, এখানে আসিলে অদূরে হিমাচল (উত্তরাখণ্ড) দেখিতে পাওয়া যায়, মরির শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে করিতে শত শত পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া যেখানে কৃষ্ণগঙ্গা এবং বিতস্তার সঙ্গম হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হই। এই স্থান সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৫০৬০ ফিট্ উচ্চ, ইহার নাম "দোমেল", ইহার উপরে আবার সমতল ক্ষেত্র, তাহার মধ্যদিয়া গভীর গর্জ্জনে বিতস্তা প্রবাহিত হইয়া সিন্ধু সমানে দ্রুতপদ হইয়াছে। আমরা বিতস্তার ধার ধরিয়া ক্রমাগত যাইতে যাইতে এক অপূর্ব্ব গিরি কাননে উপস্থিত হইলাম, ইহার নাম "বানিহাল"। এই স্থানে পাণ্ডবদিগের এক বিচিত্র মন্দির আছে, তাহার পরিণাম দেখিলে বোধ হয় ইহা নিশ্চয় বহু সহস্র বৎসরের নির্ম্মিত, সমস্ত প্রস্তর খণ্ড প্রায়

ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগ্নাবশেষ এখনও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান আছে, এ স্থানটী অতি রমণীয়। তাহার পর আমরা বারামূলায় (বরাহ মূলে, এখানে ভগবান বরাহাবতার হইয়াছিলেন) উপস্থিত হই, এখানে এক পঞ্চমুখী অনাদি মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকে "কোটীশ্বর" মহাদেব কহে। এই মহাদেবের পদ-প্রান্তে বিতস্তা আসিয়া নত-মস্তক হওত সংকীর্ণ ভাবে গিরি কন্দর ঘেরিয়া বেড়িয়া সুদূরে কৃষ্ণগঙ্গার সহিত একত্র হইয়া চন্দ্রভাগা নামে অভিহিত হওত সিন্ধুসমাগম লাভ করিয়াছে। এখান হইতে নৌকাপথে শিবপুর, সোপুর বা সুধাপুর, ক্ষীর-ভবানী এবং লোলাব প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থ সকল দর্শন করিয়া দুই রাত্রি তিন দিনে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে উপনীত হই, সহরের চারিদিকে বিতস্তা প্রবাহিতা, মধ্যে প্রখর বাহিনী বিতস্তা, পার্শ্বে বিতস্তা নানা শাখা প্রশাখা-সমন্বিত, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আবার ইহার অনতিদূরে বৃহৎ বৃহৎ হ্রদ, তাহার কূলে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উদ্যান, শত শত রকমের ফল ফুলে সুশোভিত, যাঁহারা লাহোরের "শালেমার বাগ" দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা এই সকল বাগানের নকল মাত্র। সেই সকল বাগানের মধ্যে আবার কত কত সুন্দর সুশীতল প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম স্থান ক্লান্ত পথিকদিগকে শ্রান্তি পরিহারের নিমিত্ত যেন আহ্বান করিতেছে, দেখিলে অবাক হইতে হয়, এস্থলে লোলাব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। লোলাব-নদীতীর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ময়দান, তাহার পর হিমগিরি উন্নত মস্তকে সমস্ত কাশ্মীর রাজ্য আগুলিয়া রহি-

আছে। এই গিরি-মালার পাদদেশে বিস্তর নিকুঞ্জ বন আছে। সে বনে কাশ্মীরের সকল প্রকার সুপ্রসিদ্ধ সুমিষ্ট ফল (মেওয়া) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং তাহারই তলায় পড়া অপক্ক ফলগুলি নিম্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়া বহু-মূল্যে বিক্রীত হয়। কিন্তু গাছ পাকা ফল যাহা এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমন সুমিষ্ট রসাল ফল পূর্ব্বে আমরা কখন খাই নাই, এমন সুন্দর সুবৃহৎ সেউ, ন্যাসপাতি, পিচফল কখন দেখি নাই। এই বনে প্রচুর সুস্বাদু ফল জন্মে বলিয়া এখানে ভল্লুকের উৎপাত বড় অধিক। এই ভল্লুক শিকারের জন্য ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা এখানে মহানন্দে অবস্থিতি করেন, আর আমরা তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া নৌকায় বসিয়া সুস্বাদু ফলের আস্বাদ গ্রহণ করি। ঐ সাহেবেরা শিকার করিয়া নির্ভয়ে বনে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হই!

ইহা ব্যতীত আর আর কত অপূর্ব্ব দেখিবার বিষয় আছে, যথা স্থানে তাহা লিখিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

অমরনাথ যাত্রা।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার দিন সমাগত হইয়া আসিল। শুক্লপঞ্চমীর নবীন চন্দ্র হাসিতে হাসিতে যত পূর্ণিমার নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত নব কলেবর বৃদ্ধি করিতে চলিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতের চতুঃসীমা হইতে নানা বর্ণের যাত্রী সমাগত

হইয়া শ্রীনগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন, আর মহারাজার কর্ম্মচারীগণও সসজ্জ হইয়া বসন্ত বাগে ছড়ি স্থাপন করিলেন।

সমস্ত যাত্রী সমবেত হইলে, যথা সময়ে ছড়ি অগ্রসর হইল, যাত্রীগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল, "জয় অমরনাথ স্বামীজী কি জয়" শব্দের ধ্বনিতে গগন ফাটিয়া উঠিতে লাগিল, দূরস্থ শিখরাগ্র তাহার প্রতিধ্বনি পুনরুক্তি করিয়া যেন যাত্রীগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রথম দিন পামপুর নামক স্থানে আড্ডা হইল। আমাদের সমবেত যাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫০০ ছিল, সারি বাঁধিয়া যখন তাহারা বিতস্তার কূল

একটী রূপার পত্রাবৃত পতাকার নিম্নে ঘট স্থাপন করিয়া মঙ্গলাচরণের চিহ্ন স্বরূপ বহুতর পুষ্প মালায় তাহা সুশোভিত করা হইল। দুই জন দ্বারপাল রূপার আশাশোটা হস্তে লইয়া তাহার দুই দিকে দণ্ডায়মান হইল, একজন পূজারি পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে রক্ত বর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করতঃ পুষ্প চন্দনে সুশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান হওত হস্তে রত্ন খচিত চামর ধারণ করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, সম্মুখে শত শত যাত্রী করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া"জয় অমর নাথ স্বামীজী কি জয়"বলিয়া গগনভেদী সুরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইহাকে "অমর নাথের ছড়ি" কহে, ইহা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত মহারাজ প্রচুর আয়োজন করিয়া দেন, এবং যাত্রার দিন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছড়ি (ঐ পতাকা) স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া পূজারির হস্তে সমর্পণ করেন, তখন পূজারি রাজরক্ষকগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া "জয় অমরনাথ স্বামী জী কি জয়" বলিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তৎপশ্চাৎ সম্প্রদায় ভেদে দলে দলে যাত্রীগণ একত্র হইয়া সেইরূপ জয় ধ্বনি পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে থাকেন, পথে কাহারও সাধ্য নাই ছড়ির অগ্রে চলে, অথবা ভিন্ন পথে পদার্পণ করে, এই রূপে যত দিন "অমরনাথ" দর্শন না হয়, তত দিন ছড়িদলের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়।

ধরিয়া গমন করিতে লাগিল, তখনকার শোভা অতি আশ্চর্য্য। ছড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকদল পদব্রজে চলিল; আর কতক-গুলি নৌকাপথে যাত্রা করিল। দ্বিতীয় দিনে আমরা পামপুর, অবন্তিপুর প্রভৃতি পুরাতন নগর সমূহের ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করিয়া বুদ্ধবিহারে পৌঁছি। এস্থানে বৌদ্ধদিগের পুরাতন কীর্ত্তি বিস্তর দৃষ্ট হইল, কিন্তু কালের কবলে পতিত হইয়া সে সমস্ত এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরদিন অপরাহ্ণে আমরা অনন্ত-নাগে অবস্থিতি করি, এখানকার কমিশনর পণ্ডিত শ্রীরামজু কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের আয়োজন করিয়া দেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় ৫।৬ দিনে যাত্রীগণ মার্ত্তণ্ডে একত্র হইল। আমরা নৌকাপথে গমন করিয়াছিলাম, সে পথের দ্রষ্টব্য বিষয়—যাহা কোন এক স্নেহভাজন বন্ধুকে লিখিত হইয়াছিল, পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা এস্থলে বিবৃত হইতেছে:—

এস্থলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের অমরনাথের যাত্রার আয়োজনে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পরমানন্দজী সবিশেষ সাহায্য করিয়া আমা-দিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীনগর, ২৪-৮-৯৪।

(জন্মাষ্টমী।)

যত অমরনাথের যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আমার সহযাত্রী ভ্রমণকারী বন্ধুগণ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, আমি কেবল অমরনাথের যাত্রী-দিগের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ৩১শে জুলাই

সোমবার নৌকাযোগে আমরা অমরনাথ যাত্রা করি, প্রায় ১৫০০ যাত্রী"অনন্তনাগে"আমাদের সহিত মিলিত হয়। মার্ত্তণ্ডে ভারবাহী কুলি, ডুলি বেহারা প্রভৃতিতে প্রায় ২৫০০ লোক একত্র হয়, আমার সঙ্গে ১৫ জন লোক; স্বয়ং, স্বামী স্বরূপানন্দ স্বরস্বতী, দুই জন ভৃত্য, তিন জন পাণ্ডা, ছয় জন কুলি, আর দুই জন সহিশ, একটা কাবুলি তাম্বু, আর দুইটা ঘোড়া ছিল, আমরা যখন মেলা সাগরে ডুবিয়া গেলাম, তখনকার দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য। কয়েক দল নাগা সন্ন্যাসী, কয়েক দল গিরি, পুরী, ভারতী সম্প্রদায়ের, কয়েক দল গোরক্ষনাথের কাণফাটা যোগী, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহুতর লোক। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, বম্বে, মাদ্রাজ, আফ্ গানিস্থান, পাঞ্জাব, এবং কাশ্মীর হইতে বিস্তর গৃহস্থ সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধুভাব এবং স্বধর্ম্মে বিশ্বাস দেখিলে অবাক হইতে হয়। ১০ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আমরা মার্ত্তণ্ডে অবস্থিতি করিয়া অমরনাথের পথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি, ও নিকটস্থ পুরাতন তীর্থ সকল দর্শন করি। "অনন্তনাগে" একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে অনন্তস্রোতে উৎস সকল প্রবাহিত হইতেছে, এক একটী কুণ্ডে লক্ষ লক্ষ মৎস্য বিচরণ করিতেছে। মার্ত্তণ্ডেও সেইরূপ,—বিশেষ এই যে, এখানে বহু সহস্র বৎসরের সূর্য্যদেবের এক মন্দির আছে, গিরি-গুহায় প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার স্থান আছে, একটী গুহায় একটী ঋষির পঞ্জর সমাহিত রহিয়াছে, গুহাটী ২১০ ফিট্ দীর্ঘ, ৫½ ফিট প্রস্থ, এবং ৯½ ফিট্ উচ্চ। দেখিতে অতি সুন্দর আমরা আলোক লইয়া তাহার মধ্যে গিয়াছিলাম। কথিত আছে, "ভূমৃজু"

নামক কোন ঋষির ঐ কঙ্কাল। তাহার অনতি দূরে একটী পর্ব্বত গহ্বরে আশ্চর্য্য একটী খোদিত শিব মন্দির আছে। সেই শিবপদপ্রান্তে বসিয়া আমরা অনেক ক্ষণ সমাধি শিক্ষা করি, সে স্থানের রমণীয়তা লিখিয়া ব্যক্ত করা সহজ কথা নহে।

মার্ত্তণ্ড কাশ্মীর প্রদেশস্থ হিন্দুদিগের এক মহা তীর্থ স্থান। গয়া ধামের ন্যায় এখানে লম্বোদরী তীরে তাঁহারা সমস্ত পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। যাত্রীরাও এখানে সমাগত হইয়া, মুণ্ডিত মস্তক ও পিণ্ডাদি দান করিয়া পশ্চাৎ অমরধামে যাত্রা করেন। স্থানটী দেখিলে এবং যাত্রীদিগের সংস্কার কার্য্য-নিচয় পরিদর্শন করিলে স্পষ্ট ইহাই অনুমিত হয় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির এই স্থানেই উপনীত হইয়া দৈহিক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। মার্ত্তণ্ডের রাজ-পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীমান্ নারায়ণ দাসের বাটীতে আমরা অবস্থিতি করি, এই ভদ্র পরিবার আমাদিগকে আত্মীয়ের ন্যায় যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে স্ত্রীলোকদিগের অবগুণ্ঠন নাই, পূর্ণ যুবতী পরমাসুন্দরী বধূরা সম-বয়স্ক দুহিতা সঙ্গিনীদিগের সহিত একত্র হইয়া নির্ভীক চিত্তে চির পরিচিত সুহৃদের ন্যায় আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা এবং পরিচর্য্যা করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন। প্রত্যুত: অধিকতর উৎসাহ দিয়া তাঁহাদিগকে সেবা-ব্রত শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। ইহাঁদিগের সরলতা ও সাধুভাবে আমরা মোহিত-প্রায় হইয়াছিলাম, প্রৌঢ়া গৃহিণীগণ মাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আমাদিগকে সুখাদ্য ফল উপহার দিতেন, আর অবসর কালে নিকটে বসিয়া অমর-

কথার প্রসঙ্গ করিতেন। সে সময়ে এক একবার মনে হইত, কৈলাসে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া যেন ভবানী আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, তাই অমরকথা-প্রসঙ্গ এত মধুর ও অর্থকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই রাত্রে আমরা এক গহন বনে অবস্থিতি করি, এখানে স্তূপাকার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যাত্রীমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় ধুনির বেড়া আগুণ জ্বালাইয়া সমস্ত শর্ব্বরী তাহার মধ্যে নিরাপদে অতিবাহিত করি। হিংস্র জন্তুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এরূপ করা হইয়াছিল, এবং তাহার পর হইতে প্রতি রাত্রে যাত্রীমণ্ডলী এইরূপে অগ্নি-প্রাকার মধ্যে রক্ষিত হইত। আমরা এই বনে এক মৌন-ব্রত-ধারী সাধুর দর্শনলাভ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি বাক্‌যত হইয়া এখানে তপস্যা করিতেছেন, আমরা তাঁহার আশ্রমে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অনেক ক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিলে আমরা হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি; এমন সময়ে তিনি প্রসন্ন নয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন—"বিরক্ত হইও না, যাহারা তামাসা দেখিতে আইসে, তাহাদিগের সহিত কি কথা কহিব? আমি সংসারে ত্যক্ত, সুতরাং সংসারের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ, তখন সংসারীদিগের তুষ্টিসাধন কিরূপে করিব"? সাধুর এবম্প্রকার অর্থযুক্ত বাক্য-বিন্যাসে আমরা চমকিত হইয়া উঠিলাম, এবং অধিকতর যত্নের সহিত আবার তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলাম। তাহার পর তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম তত্ত্বের যে সকল

নিগূঢ় কথার প্রসঙ্গ হইল, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল, তিনিও তখন যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন। অমরনাথের পথে তাঁহার সাক্ষাৎকার আমাদের জীবনের একটী অনুপম ঘটনা, কোন কালে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। এস্থলে আমাদের বাক্যচূড়ামণি বক্তাদিগকে এই মাত্র ইঙ্গিত করিতে পারি যে, তাঁহারা যদি নির্ম্মল চিন্তাস্রোত বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাহা হইলে বক্তৃতার তরঙ্গ আর বৃদ্ধি না করিয়া কিছু কালের জন্য বাক্‌যত হউন। যাহা হউক পরদিন প্রাতেঃ "গণেশবল" নামক তীর্থে স্নান করিয়া সন্ধ্যার সময় অমরনাথের দ্বার "পাহালগামে" পৌঁছিয়া দুই দিন তথায় অবস্থিতি করি। এ স্থানের শোভা অতি রমণীয়, চারিদিকে গগনভেদী পর্ব্বতশ্রেণী বরফে আচ্ছন্ন, নিম্নে ঘন বিজন বন, মধ্যে "লম্বোদরী" ঘোর গর্জ্জনে প্রবাহিতা, তাহার উভয় কূলে শত শত যাত্রী নানা বর্ণের তাম্বু খাটাইয়া সেই যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। সময়ে সময়ে "জয় অমরনাথ স্বামীজী কি জয়" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছেন। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তে যে ঘন বন রহিয়াছে, উহাকে 'দণ্ডকারণ্য' কহে। কথিত আছে, মহারাজ রামচন্দ্র বনবাস কালে এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ইহার অনতি দূরে ভৃগুমুনির আশ্রম, সেই আশ্রম স্থিত উৎসের জল অতি শীতল ও তৃপ্তিকর। এখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিলে চিত্ত সহজে সমাধিস্থ হইয়া আইসে, এবং ভগবান্ রামচন্দ্র ও মনস্বী ভৃগুর মহোচ্চ মনের ভাব সহজে অনুভব করা যায়। ভৃগু মুনির আশ্রমে বসিয়া

দণ্ডকারণ্যের শিখরদেশে দৃষ্টিপাত করিলে যে প্রকৃতির রমণীয়তা দর্শন করা যায়, তাহা বর্ণনাতীত। এই দিন রাত্রে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হয়; রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় দণ্ডকারণ্যের মধ্যে একটী উজ্জ্বল ও দীর্ঘ অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে সেই অগ্নি-শিখা বৃদ্ধি হইয়া প্রায় শিখর দেশ স্পর্শ করিতে লাগিল, কেহ বলিল গোপালগণ রাত্রে ওখানে অবস্থিতি করিতেছে, কেহ বলিল, প্রাচীন ঋষিগণ অমরনাথ দর্শন করিতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছেন, যাহাই হউক, দিনের বেলা ওখানে আমরা জন প্রাণী দেখি নাই, এত রাত্রে কোথা হইতে লোক আসিয়া এই গহন বনে অবস্থিতি করিতেছে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পথ অতি দুর্গম বলিয়া আমরা কোন উপায়ে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারি নাই। এই স্থানে একাদশীর বিশ্রাম করিয়া পর দিন আমরা "চন্দন বাটীতে" পৌঁছি। এ স্থান শ্রীনগরের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১২০০০ ফিট্ উচ্চ, এখানে একটী পুরাতন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, কথিত আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই স্থানে তপস্যায় নিরত থাকিয়া সৃষ্টির তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা লিঙ্গটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, পাণ্ডারা তাহা জুড়িয়া তীর্থ স্থানের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। এখানে আমরা ভোজ-পত্র ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করি, এস্থান হইতে পর দিন দেখি, নিম্নে "লম্বোদরী" ধর্ ধর্ করিয়া প্রবাহিতা, উপরে বরফের আশ্চর্য্য সেতু বহুদূর বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া বহুতর গিরি-সঙ্কট অতি-ক্রম করতঃ "শেষনাগ" হ্রদের কূলে উপস্থিত হই, এখানকার

চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতশিখর অহিফণার ন্যায় বিস্তৃত, হ্রদটি সম্পূর্ণ গোলাকার, তাহার ব্যাস প্রায় ১২ মাইল হইবে, পরিধি ৪।৫ মাইলের কম নহে। জল গভীর ও ঘন দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অথচ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, এমন চমৎকার জলের শোভা কখন দেখি নাই। পরদিন সন্ধ্যার সময় প্রায় ১৬০০০ ফিট্ উঠিয়া "বায়ুবর্জ্জনে" পৌঁছি। এ স্থান অতি ভয়ানক,—পবন দেব এস্থান রাত্রিদিন ঝঞ্চাবাতে পূর্ণ রাখিয়াছেন, মুহুর্মুহুঃ বরফ বর্ষণ হইতেছে, শীতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, (এখানে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় না, চন্দন বাটী হইতে আমরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম,) কিরূপে সে রাত্রি এখানে কাটাইয়া ছিলাম তাহা বর্ণনা করা কঠিন। চন্দনবাটী হইতে জনপদের নাম আর নাই, কোন জীব আর দৃষ্ট হয় না, পর্ব্বত সকল উলঙ্গ। পরদিন "পঞ্চতরণীর" পথে মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম। দূরতা প্রায় ১০।১২ মাইল হইবে, এ পথের চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের পুষ্প, তাহার গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে, চলিতে চলিতে গন্ধে আমরা অঘোর হইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেকে তাহার নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল, যাত্রীরা তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানা প্রকার টোট্কা ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিল, সকল অপেক্ষা আমার ঔষধ উপকারী হইয়াছিল,—আমি পূর্ব্ব হইতে এক শিশি হিং সঙ্গে লইয়াছিলাম। তাহার দ্বারা আমার এবং অনেকের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছিল, কালীপিঠে একটী পরমা সুন্দরী কাশ্মীরী কুলকামিনী হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হিং শুঁকাইয়া চেতনা দান করি, তিনি আমাকে, প্রাণদাতা

পিতা বলিয়াছেন, আর কয়েকটি সন্ন্যাসীর এইরূপ চেতনা দান করি, এমন গভীর ভয়ানক স্থান কখন দেখি নাই। এই স্থানকে পাণ্ডারা "গন্ধমাদন" বলে। মহাবীর হনুমান লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশল্যকরণী আনিতে এখানে যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরদিন "পঞ্চতরণীতে" পৌঁছিয়া আমরা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যাই। তাহার পর ভৈরব ঘাটী প্রায় ১৮০০০ ফিট উচ্চ, বরফে আচ্ছন্ন এখানে বৃষ্টি হয় না, মেঘ হইলেই অনবরত তুষারবর্ষণ হইতে থাকে, শীতে প্রকম্পিত হইতে হইতে রাত্রি ৩টার সময় যাত্রা করিয়া পরদিন বেলা প্রায় ১০টার সময় এই দুরারোহ গিরি সঙ্কটের শিখরোপরি উপনীত হই। এখানকার শোভা সকলই অভাবনীয় ও অচিন্তনীয়, ভাগ্যক্রমে সে দিন কোন রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত ছিল না, সুনির্ম্মল আকাশে মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতেছিলেন, দিগন্ত-ব্যাপী আকাশ মনোরম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, চতুর্দ্দিকে যেন রমণীয়তা মূর্ত্তিমতী হইয়া দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। উপরে অনন্ত আকাশে সূর্য্য প্রকাশিত,—নিম্নে সহস্র সহস্র পর্ব্বতশ্রেণী রজত উষ্ণীষ পরিধান করতঃ যেন ঘাড় তুলিয়া আমাদিগকে দেখিতেছিল, আবার তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কত অপূর্ব্ব রূপ প্রদর্শন করিতেছিল। পশ্চাৎদিকে "পঞ্চতরণী" পঞ্চধারায় প্রবাহিতা থাকিয়া যেমন আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল, সম্মুখে অমরাবতী গঙ্গা কলনাদে প্রবাহিতা হইয়া তেমনি যাত্রিগণকে অমরধামে আসিতে নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন। আমাদের শরীর এত ঘর্ম্মাক্ত হইয়া-

ছিল যে; তৎকালের শীতল বায়ু অমৃত বর্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, আর একটী স্বর্গোপম শোভা, যাহা আমরা সে স্থলে দর্শন করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। ভৈরব ঘাটীর শিখর হইতে "অমরনাথ" বা কৈলাস পর্ব্বতশ্রেণী প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে ১১০০০ মাইল নিম্নে "অমরনাথের" মন্দির স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত সহস্র সহস্র শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার একটী মন্দিরে আমাদের আরাধ্য দেবতা "অমরনাথ" বিরাজ করিতেছেন। কিয়ৎকাল এ স্থলে বিশ্রাম করিয়া আমরা মন্দিরের পথ অনুসরণ করিলাম, নামিতে নামিতে অর্দ্ধপথে গয়ার মাতৃপরীক্ষার ন্যায় "গর্ভযোনি" নামক তীর্থের ভিতর দিয়া কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত শিখর পদতলে রাখিয়া আমরা অমরগঙ্গা-কূলে উপনীত হইয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এখানে আর সে সুন্দর মন্দিরশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে না, অমরাবতী গঙ্গা নিঃশব্দে তুষার রাশির মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া দূরস্থ "মানস সরোবরে" পতিত হইতেছেন। সে সুন্দর মন্দির শ্রেণী পাষাণময় পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়া গগন ভেদ করিয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য মনোহর হইলেও, সে সুন্দর মন্দিরের অস্তিত্বের অভাব দেখিয়া আমরা বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। বস্তুতঃ পাপচক্ষে কৈলাস দর্শন করা সহজ কথা নহে, তাই বুঝি ভূতভাবন ভবানীপতি কৈলাসের সুখ সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি পথ হইতে অন্তর্হিত করিলেন, আমরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ধীরে ধীরে দীন-শরণ ভগবান "অমরনাথের" চরণে

শরণাগত হইবার জন্য অবতরণ করিতে লাগিলাম, কত লোক পাথর ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নামিতে লাগিল, কত লোক সুতীক্ষ্ণ শাণিত লৌহ-ফলক সংশ্লিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ যষ্টি হস্তে ধারণ করতঃ অগ্রে দৃঢ় রূপে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে অন্যের পদানুসরণ করিতেছে, কেহ কাহারও হস্ত ধারণ করিবার উপায় নাই, বিপদস্থ হইলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং সকলেই আপনাপন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত নতমস্তক হইয়া গন্তব্য পথে গমন করিতেছে। এখান হইতে যদি এক বার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে যে কোন্ রসাতলে যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, একে ঘোর নিম্নদেশে অবতরণ, (পাহাড়ে ওৎরাই) তাহাতে মাধ্যা-কর্ষণ শক্তির আকর্ষণ, অপর দিকে পড়ি পড়ি বলিয়া প্রাণ-ভয়ে মন আকুল, এমন অবস্থায় আমরা কি ভাবে এই সঙ্কট পথ উত্তীর্ণ হইতেছি, পাঠক কি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন? গিরি-সঙ্কট শব্দের অর্থ এই সঙ্কট পূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া না দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না, এই-রূপে প্রাণ হাতে করিয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ অমরগঙ্গা পার হইয়া "অমরনাথের" পাদমূলে উপস্থিত হই। অদূরে অমরগঙ্গা কৈলাসের শিখর হইতে পতিত হইয়া যেখানে "অমরনাথের" পদ ধৌত করিতেছিলেন, সে স্থানে স্নান করিয়া আমরা স্পন্দ-হীন হইলাম, শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে হাতের গামছা আর নিংড়াইতে পারি না, পর-ক্ষণেই পাণ্ডারা আমাদিগের আপাদমস্তক বিভূতি মাখাইয়া দিল, (এক প্রকার ঐ পর্ব্বতের শুভ্র বর্ণের চূর্ণ মৃত্তিকা)

৫।৭ মিনিটের মধ্যে আমাদের সর্ব্ব শরীর শুভ্র বর্ণ হইয়া উঠিল, শীত বাতের আঘাত কোথা হইতে চলিয়া গেল, সুতরাং শরীর বিলক্ষণ পুষ্ট ও গরম হইয়া উঠিল, তাহার পর এই নগ্ন বেশে(অনেকে আপনাপন কটিদেশে ভোজ পত্রের আচ্ছাদন দিয়াছিলেন) যখন "জয় অমরনাথ স্বামী-জী কি জয়" বলিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন-কার শোভা অতি রমণীয়, যেন শত শত মনুষ্য শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিব রূপে শিবধামে যাত্রা করিতেছেন। সে ভাব কথায় বর্ণনা করা যায়না, বস্তুতই তখন আমরা অমরধামে উপনীত হইয়াছি। অমরগঙ্গা হইতে অমর-নাথের মন্দির প্রায় ৪০০ ফিট উচ্চে, গহ্বরটী প্রায় ৫০ গজ দীর্ঘ, সম্মুখের ভাগ ৫০ গজ প্রস্থ, মধ্যের প্রস্থতা ৩০ গজ, এবং উচ্চতায় ৩০ হইতে ৩৫ গজ পর্য্যন্ত, তাহার মধ্যদেশে পর্ব্বত-পার্শ্বের উত্তরাংশে "অমরনাথ" রসলিঙ্গ রূপে অপূর্ব্ব ভাবে পর্ব্বত গহ্বর ভেদ করিয়া উত্থিত হওত জনসমাজকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিতেছেন। লিঙ্গটীর অবয়ব ঐরাবত সদৃশ ঠিক একটী বৃহৎকায় শ্বেত হস্তী, হস্তীটী যেন গহ্বরের মধ্যে শুঁড় প্রলম্ব করিয়া দিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহি-য়াছে, যাত্রিগণ সমবেত হইয়া সেই রসলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া করতালি বাদ্য করিতে করিতে (এখানে কোন প্রকার উচ্চরব করিবার কাহারও সাধ্য নাই, শঙ্খের বাদ্য ধ্বনি করা দূরে থাকুক, জোরে করতালির বাদ্য করিলে বর্ষাধারার ন্যায় তুষাররাশি বর্ষণ হইতে থাকে, সুতরাং কাহারও উচ্চরবে কথা কহিতেও সাহস হইতেছে না। প্রহরি-

গণ সেই জন্য প্রতিক্ষণে সতর্ক করিয়া দিতেছে, এবং দর্শনা-লিঙ্গন ও পূজা কার্য্য সমাধা হইলে পর, "পঞ্চতরণীতে" ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত করিতেছে, যাত্রীরাও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নতমস্তকে "অমরনাথকে" প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে) "অমরনাথের" পদ প্রান্তে উপস্থিত হওত যখন সকলে "ঈশ্বর দর্শন পায়া—রে, ঈশ্বর দর্শন পায়া" বলিয়া সমস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখনকার ভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। (এখানে আর কয়েকটী কক্ষে ভগবতী ও গণদেবের তুষার-মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাহা পাণ্ডাদিগের চাতুরী ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া, এ স্থলে তাহার অধিক উল্লেখ করিলাম না) পৃথিবীর মানুষ আর তখন মানুষ নাই, সকলেই শিব হইয়া গিয়াছে, শ্বেতাঙ্গ শিব সকলের শরীরে প্রবেশ করিয়া যেন সকলকেই শ্বেতাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে, পাদমূল হইতে মস্তকের শিখা পর্য্যন্ত সমস্তই শ্বেত বর্ণে সুশোভিত, হস্ত শ্বেত, পদ শ্বেত, বুক পীঠ শ্বেত, মস্তক শ্বেত, আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্ষেত্র শ্বেত বর্ণ হওয়ায় এ স্বর্গীয় শ্বেত দেশের সকলই শ্বেত বর্ণ দেখাইতেছে, কেবল একটী অঙ্গ শ্বেত বর্ণে পরিণত হইতে পারে নাই, পাঠক, বল দেখি—তাহা কি? বুঝিয়াছ, তথাপি আমি বলিয়া দিতেছি, সেই তোমার নয়নের তারা। তাহাই কেবল নিজ কৃষ্ণ বর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, কেন জান? সে নিজ কর্ম্ম-ফলে যে কলঙ্ক কালিমা সর্ব্ব শরীরে মাখাইয়াছিল, তাহা আজি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া ঐ যেন দেখা দিতেছে, ভক্তেরা নাকি কেহ কেহ উহা স্বহস্তে উৎপাটন

করিয়া ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, তুমি কি তাহা পারিবে? না, না, তাহা করিতে হইবে না, ভুতভাবন ভবানীপতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এখন ঐ কলঙ্ক কালিমা ঐ রূপেই ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া তোমার দৃষ্টি পথের সহায়তা করিবে, এবং স্তিমিত নয়নে যখন তুমি ধ্যানস্থ হইবে, তখন তোমার অন্তর্জগতের অজ্ঞান রূপ অমানিশা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উহা বিজ্ঞান রূপ পরম জ্ঞান লাভ করিবার সহায় হইবে, তাহা হইলে পাপ আর পাপ থাকিবে না, কলঙ্ক আর কালিমায় রহিবে না, চিদানন্দ চিত্তাকাশে উদিত হইয়া তোমার অন্তর্জগৎকে স্বর্গধাম করিয়া তুলিবে, ভক্তের চক্ষু ব্যতীত সে দৃশ্য কেহই দর্শন করিতে পারিবে না। ধ্যান পূজা সমাপন করিয়া আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে "অমরনাথের" মহিমা দর্শন করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে একটী মধুর রব শ্রবণ করিলাম। (ঠিক যেন জল তরঙ্গের সুরের মত) উপরে তাকাইয়া দেখি, একটী কপোতাকার কোকিলবর্ণ শুক পক্ষী, তাহার চঞ্চু রক্তবর্ণ, দেখিতে অতি মনোহর, তাহা দেখিয়াই আমি স্বামী স্বরূপানন্দকে আহ্বান করিলাম, তিনি সহজে দেখিতে না পাইয়া যখন কৈ, কৈ করিতে করিতে আমার নিকটে আসিলেন, তখন সেই স্বর্গীয় শুক আবার সেই মধুরকণ্ঠে মধুর রব করিতে করিতে আমাদের সম্মুখ দিয়া পর্ব্বতের অপর প্রান্তে উড়িয়া গেল। পুরাতন যাত্রীরা কহিতেছে, এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য তাহারা কখন দেখে নাই, আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম, আজি দুই দিন আমরা এ দেশে একটী প্রাণী দেখি নাই, অথচ এই

অপূর্ব্ব অভাবনীয় পক্ষী কোথা হইতে আসিল? ইহার জবাব আমার মত নরাধম কি দিতে পারিবে? ভক্তজনের প্রাণ-তোষী "অমরনাথ" কি রসলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া সুন্দর শুক পক্ষীরূপে তাহাদিগকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিলেন? অথবা আমার ন্যায় ঘোর পাষণ্ড নাস্তিকের অবিশ্বাসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করাইবার জন্য এই ভাবে এইরূপে আমাকে চরিতার্থ করিলেন? অথবা অমরকথা প্রসঙ্গে যে শুক পক্ষীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা কি সেই চিরজীবী শুক পক্ষী? ইহার উত্তর পাঠক দিবেন, আমি অবাক্ হইয়া পড়িয়াছি। অমর-গঙ্গা অমরাবতীতে স্নান করিয়া অমর হইয়াছি, এখন "অমরনাথের" কৃপায় এই ভাব জীবনের অবশিষ্ট কাল সমান থাকিলে চরিতার্থ হই। স্বামী স্বরূপানন্দের সহযাত্রী হইয়া যে অমর ধামে পৌঁছিয়াছিলাম, সে জন্য এ জীবনে তাঁহাকেও ভুলিতে পারিব না, আমরা প্রায় ৭ ঘণ্টা কাল এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্নে অমর গঙ্গার অপর পার ধরিয়া অন্য পথ দিয়া পঞ্চতরণীতে পৌঁছিয়া সে রাত্রি সেখানে অবস্থিতি করি। সৌভাগ্যক্রমে আকাশ সে দিন নির্ম্মল ছিল, নীলাকাশে পূর্ণ চন্দ্র পূর্ণ বিকাশে বিরাজিত থাকিয়া যাত্রীগণের যে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, হাস্যমুখে তাহা যেন ব্যক্ত করিতেছিলেন, তুষার-মণ্ডিত চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতমালা শুভ্র বেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রলোক স্পর্শ করিবার নিমিত্তই যেন মস্তকোত্তোলন করিতেছে, চন্দ্রদেব তাহাদের এই উচ্চাশা দমনের নিমিত্ত তাহাদের মস্তকোপরি তীর ধারে সহস্র কিরণ বিকীর্ণ

করিতে লাগিলেন, আমাদের বোধ হইতে লাগিল, কৈলাস-শিখর কৈলাসপতির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সে বাধা অতিক্রম করতঃ মস্তকোত্তোলন করিয়া যেন চন্দ্রলোক স্পর্শ করে করে হইয়া উঠিল। এই ভাবে ক্রমে যত রাত্রি গত হইতে লাগিল, পূর্ণ চন্দ্র সেই ভয়ে ভীত হইয়াই যেন পলায়ন-পরায়ণ হইলেন, তাই দেখিয়া করুণাধার কৈলাস পতি কারুণ্য রসে প্লাবিত হইয়া—যেন কোটী কোটী চন্দ্র-মণ্ডল উৎপন্ন করিয়া কৈলাসকে উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন, সুতরাং আমরা যে দিকে তাকাই, পূর্ণ চন্দ্রের পূর্ণ প্রভায় সকল দিক পূর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল, পর্ব্বতমালার পাদদেশ চন্দ্রকলায় পূর্ণ, শিখরদেশ পূর্ণ চন্দ্রালোকে পূর্ণ, যে দিকে দেখ, কোটী চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আমাদের গগন-চন্দ্রকে প্রভা-শূন্য করিয়া তুলিতেছে। তিনি যেন তাই দেখিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে আত্মহারা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতপদে অস্তাচলের চূড়াবলম্বী হইলেন। আমরা সমস্ত রাত্রি এই গিরি চন্দ্রের অপূর্ব্ব সংগ্রাম পরিদর্শন করিয়া চমকিত হইলাম। আমরা এই রাত্রে আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, গগন পথে যে মেঘমালার ন্যায় (Milkway) কাঞ্চন-গঙ্গা, দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নহে, (A cluster of starএর) এক তারকা-মণ্ডলীর পুচ্ছ মাত্র। দক্ষিণাকাশে কতক গুলি প্রদীপ্ত নক্ষত্র একত্র সমাবেশিত, তাহার মধ্য হইতে অনবরত ধূমরাশি উদ্গত হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হওত, উত্তরাকাশে প্রবহমান রহিয়াছে, সেই নক্ষত্রপুঞ্জের গতির সঙ্গে তাহাদেরও গতি সেইরূপ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দূরবীক্ষণ, যন্ত্র দ্বারা

দেখিলে আরও এবিষয়ের তথ্য সুন্দর রূপে আবিষ্কৃত হইতে পারিত। আমাদের বোধ হইতে লাগিল, প্রলম্বমান ধূমরাশি দক্ষিণ পথ হইতে আসিয়া যেন কৈলাসের শিখরোপরি সংলগ্ন হওত স্বর্গ গমনের সোপান রূপে প্রতিভাত হইয়া মহাপন্থার সত্যতার আভাস দিতে লাগিল। তাহার পর দিন প্রাতে ফিরিয়া আসিবার সময় অন্য পথ দিয়া অতি সহজে আসিয়াছি। যদিও তাহার গিরিসঙ্কট স্থানে স্থানে ভয়ানক ছিল, তথাপি "অমরনাথের" কৃপায় তাহা অতিক্রম করিতে অধিক কষ্ট হয় নাই। এপথের একটী স্থান ভয়ানক দুর্গম ছিল, তাহা পিশুঘাটীর পর প্রান্তে "হত্যারিতলাও" বলিয়া অভিহিত হয়। সে স্থানের নাম করিলে, আমাদের কথা দূরে থাকুক, পাণ্ডাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শুনিতে পাওয়া যায় তিন বৎসর অতীত হইল, প্রায় ৩৫০ জন যাত্রী এই স্থানের তুষারাঘাতে আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহারা অদ্যাপি নাকি "হত্যারিতলায়ের" তলায় নিমজ্জমান রহিয়াছে। "হত্যারিতলাও" একটী গভীর জলপূর্ণ তুষারাচ্ছন্ন দীর্ঘ সরোবর, তাহার চতুর্দ্দিক গগনভেদী উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের বরফ নিবাস, জলে স্তূপাকার বরফ রাশি ভাসিতেছে, নীলবর্ণ জল রাশির উপর আকাশের নীলাভা প্রতিফলিত হইয়া এক ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কাহার সাধ্য সে দিকে দৃষ্টিপাত করে? উপরের শিখর শ্রেণী অহিফণার ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া যেন পথিকগণকে দংশন করিবার নিমিত্ত নতমস্তক হইতেছে, তাহার সহস্র সহস্র ফিট নিম্নে অতলস্পর্শী জলরাশি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দন্তপ্পাতি (উচ্চ উচ্চ স্তূপাকার বরফ রাশি জলে যাহা

ভাসিতেছে) বিস্তারিত করিয়া কাল রূপে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহার কূলে একটী সংকীর্ণ পথ প্রলম্বমান রহিয়াছে। সেই পথ দিয়া যখন আমরা যাইতেছিলাম, তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উভয় দিক হইতে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, পাণ্ডারা উপর নীচে তাকাইতে নিষেধ করিয়া নত মস্তকে গমন করিতে বার বার সতর্ক করিয়া দিতেছিল, সে অবস্থা এখনও মনে করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ সে দিন সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন পথ অতিক্রম করিয়া আমরা যে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছি, তাহার আর সন্দেহ নাই। "এই হত্যারিতলাও"প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতের উপর স্থাপিত, এখান হইতে "আস্থানমর্গ" প্রায় ১০০০০ ফিট্ নিম্নে, তথা হইতে অবতরণ করিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া যখন আমরা প্রচুর পরিমাণে আহারীয় বস্তু প্রাপ্ত হইলাম, (এখানে মহারাজা যাত্রীদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে হালুইকর পাঠাইয়া লুচি, কচুরি এবং অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহুবিধ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন) তখন সকল কষ্টের অবসান হইল, সন্ধ্যার সময় আমরা বরফ বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া নিরাপদে "চন্দনবাটীতে" পুনরায় উপনীত হইলাম, এখানে আসিয়া শুনিলাম, আমাদের প্রস্থানের পর দিন হইতে "অমরনাথে" তুষার বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ভগবানের কৃপা! আর ১০।১২ ঘণ্টা সেখানে থাকিলে আমরা আজি তুষার গর্ভে নিহিত থাকিতাম।

আমরা প্রায় ১৯ দিনে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া

সন্ত কল্য এখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি। পথ শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত এখানে আর এক সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিয়া পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করিব, তাহার পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে করিতে শারদীয় উৎসব সময়ে জন্মভূমিতে তোমাদিগকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব, এই ইচ্ছা। এখন "অমরনাথের" কৃপায় কি হয় দেখা যাইবে।

অচ্ছোদ সরোবর।

মহাকবি বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীতে যে "অচ্ছোদ সরোবরের" কথা উল্লিখিত হইয়াছে, মহাপ্রাণা মহাশ্বেতা যেখানে তপস্যা করিয়া ঋষিকুমার পুণ্ডরিকের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, মার্ত্তণ্ড হইতে তাহা প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে। সে স্থানের রমণীয়তা কি লিখিব, এই সময়ে আর একবার কাদম্বরী পাঠ কর, মহাশ্বেতার তপস্যা মনে কর, তাপস পুণ্ডরিকের স্বাভাবিক জ্ঞান মনে কর, তাহার পর "অচ্ছোদসরোবরের" কূলে উপনীত হও। ইহাকে কাশ্মীরীরা "আচ্ছাবল" কহে। মহামনা মুনিগণ প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হইয়া পুরাকালে এখানে কত রূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার উজ্জ্বলতর প্রমাণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে। কাশ্মীরের ক্ষত্রিয় রাজগণ কত কাল না জানি ইহাকে প্রমোদ কানন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পর সুখাভিলাষী সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহার শোভায় বিমোহিত হইয়া এখানে যে সকল রমণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, প্রায় ৩৫০ বৎসর অতীত হইল,

তথাপি তাহার সৌন্দর্য্যের অণুমাত্র লোপ হয় নাই। প্রকৃতিদেবী এখানে শতবিধ ফুল ফলে সর্ব্বক্ষণ সাজিয়া বসিয়া আছেন, উৎস সকল চতুর্দ্দিকে নানা রকমে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার জল যেমন স্বাদু ও সুশীতল, সে বনের ফলও তেমনি মধুর ও পুষ্টিকর, সেখানে বিবিধ বর্ণের পক্ষীদিগের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে বিমোহিত হইতে হয়। এখানে আমরা ৩ ঘণ্টার জন্য আসিয়া "প্রকৃতির শোভায় এমন বিমোহিত হই যে, তাহার পর ৩ রাত্রি ৩ দিন কাটিয়া গেল, তথাপি তদ্দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। হৃদয়ে প্রাণাধিক "অমরনাথের" দর্শনাকাঙ্ক্ষা বলবতী না থাকিলে এরূপ রমণীয় স্থান সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম না। সুবিখ্যাত ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা সকলে সমস্বরে কহিয়াছেন, এমন সুন্দর স্থান কাশ্মীরে আর নাই। আমরা যে সকল মধুর ফল এখানে খাইয়াছি, রমণীয় ফুল দেখিয়াছি, গন্ধমাদন পর্ব্বত ব্যতীত তাহা আর কোথাও দেখিব কিনা জানি না। "অমরনাথ" হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রায় ২২ খান পত্রের জবাব লিখিতে হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত বিবরণ মনের মত করিয়া এ সামান্য পত্রে লিখিতে পারিলাম না, সে জন্য লজ্জিত হইতে হইয়াছে। ভরসা করি, পাঠকালে তোমরা আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লাহোরস্থ "পয়সা আকবার" নামক সংবাদ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, পশ্চাৎ তাহাই "অমরনাথ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তখন তোমরা যদি কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ কর, তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে।

কারণ তাহাতে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইতেছে।

জনক মহল।

"অমরনাথ" হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় আমরা "জনক মহল" দর্শন করিয়া আসিয়াছিলাম। রাজর্ষি জনক এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, আমাদের মিথিলাবাসী জনক কি আর কেহ? ইহা নিরূপণের নিমিত্ত এখানে একখান লৌহ-নির্ম্মিত ধনুক রহিয়াছে, এক ছড়া প্রস্তর খণ্ডের মালা, একখান কাষ্ঠ নির্ম্মিত রুটি, আর দুইটী বর্শা রহিয়াছে। বিবেচনা করিলে অনুমিত হইবে, জানকীর বিবাহের পর মহারাজ জনক প্রথমে রাজার ন্যায় দল বল সহ মহাসমারোহে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার পর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া এবং তপোবনের প্রাধান্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করতঃ তপস্যায় নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার সমাধি মন্দির এক অপূর্ব্ব পর্ব্বত গহ্বর, বহু ব্যয়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

তথা হইতে প্রকৃতির শোভা চমৎকারিণী, সমস্ত কাশ্মীর ক্ষেত্র নিম্নে বিস্তারিত রহিয়াছে। শালী ধান্যের ক্ষেত্র সকল নীল, পীত ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, চারিদিকের বন, ফল ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে, "লম্বোদরী" (আমি ইহার নাম দুগ্ধ-গঙ্গা রাখিয়াছি, ইহার জল ঠিক ঘন দুগ্ধের মত শুভ্র বর্ণ) "শেষনাগ"

হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া "জনকমহলের" সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতঃ বহুদূরে দক্ষিণ পথ অতিক্রম করিতে করিতে "অনন্ত নাগে" আসিয়া বিতস্তায় মিলিত হইয়াছে। দুগ্ধবতী গঙ্গার ন্যায় নিম্নে প্রবাহিতা, সেখানে জনকের পদপ্রান্তে বসিয়া তপস্যা করিবার জন্য আমরা দুই দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। স্থান-মাহাত্ম্যে সেখানে সমাধি সহজে লাগিয়া যায়, গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সমাধির নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদের শরীর অল্প ক্ষণেই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, হৃদয় প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সমাধি মন্দিরের আকাশ যেন প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের চৈতন্য উৎপাদন করিয়া দিল, সমাধিস্থ হইতে তৎপর হইবার জন্য যেন ব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমরা তৎক্ষণাৎ মহর্ষির চিন্তার ধন সেই চিন্তামণিকে স্মরণ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু মনে সাংসারিক কোনরূপ চিন্তার আন্দোলন হইল না। কত সহস্র বৎসর গত হইল, মহারাজ জনক অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার সমাধি মন্দিরে তাঁহার সত্তা যেন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এই জন্য বোধ হয় জনক ভবন হিন্দু মুসলমানের আরাধ্য স্থান হইয়া রহিয়াছে। আমরা যে, সেখানে থাকিয়া মহোচ্চ ফল লাভ করিয়াছিলাম, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরদিন মহর্ষি "গৌতমের" আশ্রমে উপনীত হই, সেখানকার প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয়। তাহার পর "ভৃগু" মুনির আশ্রম, আমরা এখানেও অনেক ক্ষণ সমাধিস্থ ছিলাম। আশ্রম-বাটিকার শোভা যেমন রমণীয়, সেখানকার ফুল ফলও তেমনি সুন্দর, এখানে আমাদের স্নান

মানুষ আসিলে সহজেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিলাম, কয়েকজন ইংরাজ তাম্বু খাটাইয়া সপরিবারে এখানে বাস করিতেছেন। এখানকার উৎস অতি রমণীয়, তাহার জল যেমন পবিত্র, তেমনি পীড়ানাশক, শুনিতে পাই এই জল পান করিয়া কত প্রকার উৎকট রোগ হইতে মনুষ্য মুক্তি পাইয়াছে। তাহার জল পান করিয়া আমার পাপদেহ পবিত্র হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ পড়িলে যে সকল মহাত্মাদিগের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই তপস্যার স্থান এখানে,—(অমরনাথের পথে)।

মহারাজ রামচন্দ্র বনবাস কালে যে বনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা, এবং পাণ্ডবেরা যে সকল গহন বনে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্ট করিলাম। বস্তুতঃ ভারতে যদি "ভূস্বর্গ" আর কোথাও থাকে তবে তাহা এই।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী।

কাশ্মীরে প্রায় ৫ মাসের অধিক কাল অবস্থিতি করিয়া নানা স্থান পরিদর্শন করিলাম। বহুতর সাধু সঙ্গ করিলাম, মহারাজার উচ্চ পদস্থ বহুতর কর্ম্মচারীর সহিত বন্ধুত্ব করিলাম, আমাদের দেশের যে কয়েক জন উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালী এখানে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত কয়েক দিন অবস্থিতি করিলাম, P. W. D. র ইন্‌জিনিয়ার বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, চিফ্‌ জজ্‌ বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ্‌ মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আশুতোষ মিত্র, এবং ফরেন্‌ সেক্রেটরী বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইহাঁদের মধ্যে প্রধান।

ঋষিবর বাবু আমার "অমরনাথের" জন্য অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবেন, তাহার জন্য যত্ন পাইতেছেন, আগামী কল্য তাঁহার ভবনে আমাদের এক জাতীয় সম্মিলনী হইবে, সে জন্য তিনি আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, ভরসা করি, আমাদের ভ্রাতৃ ভাব সেখানে সংবর্দ্ধিত হইবে। "অমরনাথের" পথের কষ্ট নিবারণের জন্য মহারাজার সমীপে এক আবেদন করা হইবে, তাহার জন্য সমস্ত যাত্রীর সহি সংগ্রহ করা হইয়াছে, অদ্য প্রাতে এখানকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সে জন্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাঁহারা আগামী রবিবার এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া সে প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় বিধান করিবেন।

বিরুদ্ধপক্ষ যত কেন বলুন না, বাঙ্গালীজাতি যেখানে যখন আমন্ত্রিত হইয়াছেন, সেখানে তখন তাঁহারা যার পর নাই দক্ষতা এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, মান্দ্রাজ, ভূদেব বলিয়া অপরিচিত বাঙ্গালী বিবেকানন্দকে পূজা করিতেছেন। বম্বে, ন্যায়পরায়ণ শ্রীমৎ সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে উচ্চ হইতে উচ্চাসনে আসীন দেখিতে চাহিতেছেন, তাই শত বিপদের মধ্য হইতে নির্ভীক শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাতরুত্থিত অরুণের ন্যায় সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিয়া হায়দ্রাবাদের আকাশে শোভমান। রত্নামে, [ন]বীন চন্দ্র কয়েক দিনের জন্য প্রভাম্বিত থাকিয়া কত অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র রায় সামান্য বাঙ্গালী

হইয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পাঞ্জাবের অধ্যাত্ম জগতে রাজ্য করিয়া-গিয়াছেন। সেকালে এমন সভা সমিতি ছিল না, যাহাতে নবীন চন্দ্র শোভমান না থাকিলে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিত। পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ অধিনায়ক ডাক্তার লাইট্‌নার কতবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "নবীন চন্দ্ররূপ চন্দ্রে পাঞ্জাব প্রকৃতরূপে আলোকিত", তাঁহার মৃত্যুর পর লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র; "সিবিল এবং মিলিটারী গেজেট" এবং "ট্রাইবিউন্‌," মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাবু নবীন চন্দ্র রায় এক কালে পাঞ্জাব প্রদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ও সকল প্রকার সভাসমিতির প্রাণস্বরূপ (Power) ছিলেন"। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষেরা বাঙ্গালী জাতির প্রতি সুপ্রসন্ন না থাকিলেও আজি এলাহাবাদ হাইকোর্টে বাবু প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দনীয়, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মন্ত্রীসভায় বাবু চারু চন্দ্র মিত্র বিরাজিত। পাঞ্জাবে বাঙ্গালী জাতির বিদ্বেষ্টা কম না থাকিলেও শতবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাবু প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজি সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে আসীন। সেইরূপ স্বর্গগত মহারাজ রণবীর সিংহ পাঞ্জাব ক্ষেত্র হইতে নীতিপরায়ণ উকিল দলের দুই কুল দেখিয়া বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত করিয়া, বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নিজ সিংহাসন নবরত্নে সুশোভিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে আমাদের সহিত সিমলা শৈলে মহারাজার সাক্ষাৎ হয়, তৎকালে তিনি নীলাম্বর বাবুর জ্ঞান-গরিমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া-

ছিলেন। আবার এখন আমরা কাশ্মীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দেখি, সর্ব্বত্র নীলাম্বর বাবুর গুণগান হইতেছে, তিনি শতবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন,—কি বিচার বিভাগ, কি ব্যবসা বাণিজ্য, কি পূর্ত্ত বিভাগ, কি শাসন তন্ত্র সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত থাকিত। কি কারণে এমন সুযোগ্য কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে রাজ্য অবসৃত হইল, না বুঝিতে পারিয়া আমরা কি? সমস্ত রাজ্যের লোকও হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছে। অথবা স্তম্ভিত হইবার কারণ কি? কাশ্মীরে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। কথিত আছে, সুশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন মানসে সম্রাট বিক্রমাদিত্য একবার মাতৃগুপ্ত (কবি কেশরী কালিদাস) কে কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত অসাধারণ বিদ্যাবলে কাশ্মীরের রাজ-কার্য্য সুচারু রূপে পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে শুনিলেন, ভারতের আদিত্য বিক্রমাদিত্য অস্তমিত হইয়াছেন। অমনি রাজপাঠ সেই ভাবে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের সাগর, প্রীতির অবতার মাতৃগুপ্ত—কালিদাস যোগী বেশ ধারণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন, ইতিহাস অদ্যাপি তাহা নিরূপণ করিতে পারে নাই। উপস্থিত ঘটনাও ঠিক সেই রূপ বোধ হইতেছে। গুণগ্রাহী মহাবীর রণবীর সিংহ বীর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চির যোগ নিদ্রায় সমাহিত হইলে, মাতৃ-গুপ্তের ন্যায় নীলাম্বর কাশ্মীরের নীলাম্বর পরিত্যাগ করিয়া, যে অম্বরান্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছেন, বিচিত্র কি? আমরা নীলাম্বর বিরহ-কাতর, কত শত দরিদ্র প্রজার নিকট শুনি-য়াছি যে, কাশ্মীরের নীলাম্বরে নীলাম্বর-চন্দ্র বর্ত্তমান আছেন,

তবে আকাশ কুজ্ঝটিকাময় বলিয়া তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাই-তেছে না। প্রতাপ সিংহের প্রতাপে ক্ষণস্থায়ী কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইলেই, আবার সেই নীলাকাশে নীলাম্বররূপ চন্দ্র সমুদিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভগবান করুণ, দুঃখ, দারিদ্র্য-পীড়িত, কাঙ্গাল কাশ্মীরীদিগের এ কথা সত্য হউক। আজি কালি বাঙ্গালী জাতির গৌরব রক্ষা করিতে তথায় বাবু আশু-তোষ মিত্র Chief medical Officer, এবং বাবু ঋষিবর মুখো-পাধ্যায় Chief Justice অবস্থিতি করিতেছেন। ডাক্তার মিত্র, কি ইউরোপীয় রাজ-কর্ম্মচারিগণ, কি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত দেশীয় কর্ম্মচারিগণ সকলে তাঁহার সুদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার মিউনিসিপ্যাল প্রবন্ধ এবং শ্রীনগরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন সম্বন্ধের কয়েকটী প্রস্তাব ও শিক্ষা-সমিতি সংস্কা-রের প্রস্তাবসকল পাঠ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্বান মণ্ডলী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। কাশ্মীরের গুণগ্রাহী জনগণের অনেকের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, "সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা ডাক্তার মিত্রকে এখানে পাইয়াছেন। (He is truely an acquisition to the Cashmir Raj)। সৌভাগ্যক্রমে কাশ্মীরে অবস্থিতি কালে আমরা সকল সম্প্র-দায়স্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অবসর পাইয়াছিলাম—, কি উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী, কি দেশের মান্য গণ্য ধনবান এবং বিদ্বান মণ্ডলী, কি মধ্যবিৎ লোক, কি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক, সকলেরই সহিত আমাদের প্রায় ৬ মাস কাল সংশ্রব ছিল, তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে যখন তখন ঋষিবর বাবুর অমায়িক-তার,ন্যায়পরতার এবং পরদুঃখ-কাতরতার ভূয়সী প্রশংসা করি-

তেন। এক দিন কথা প্রসঙ্গে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিলেন, "ঋষিবর আমাদের ঋষি, ভাগ্য বলে আমরা এমন ঋষিবরকে এ দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দেশে বিচারপতি-পদে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার অমায়িকতায়,—আমরা প্রমুগ্ধ, ন্যায়পরতায়,—নিয়ন্ত্রিত, এবং সুবিচারে,—সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। বলিতে কি, ঋষিবর বাবুর ন্যায় দয়া-ধর্ম্ম-সমন্বিত সুবিচারক ইতিপূর্ব্বে আমাদের বিচারাসনে আর কখন দেখি নাই, তিনি দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বস্তুতঃ আমাদের মনে একটু জাতীয় ভাবের আশা উদ্দীপিত হইল, তাই সে দিন আমরা ঋষিবর বাবুর সুরম্য গৃহে উপবিষ্ট হইয়া জাতীয় সম্মিলনী সভার উদ্বোধনে মঙ্গলাচরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলাম—"ভগবন! যদি দুঃখ-দুর্দিনে পীড়িত বঙ্গের মুখের দিকে আবার তাকাইয়াছেন, তবে একবার সস্নেহে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, গুরু ভারে অবনত বঙ্গসন্তান আবার জাগিয়া উঠুক, আবার সেই পুরাতন গাথা গান করিয়া,—"জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়" বলিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভারতাকাশ ভারতের যশোগানে পূর্ণ হউক। বাঙ্গালি! তুমি যেখানে থাক, যে ভাবে অবস্থিত হও, দেখিও যেন কদাচ ভুলিওনা যে তোমার জীবনের একটী মহৎ ব্রত আছে, তাহা তোমাকেই উদ্‌যাপন করিতে হইবে, সে ব্রতের হোতা—ধর্ম্ম,যাজ্ঞিক—নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ, এবং সদস্য—নীতি ও ন্যায়পরতা, দেখিও তাহাদিগকে ছাড়িয়া এক পদ কখন ও অন্যত্র গমন করিও না"।

উপসংহার।

এখানকার রমণীয়তা বলিয়া বা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, দত্তাত্রয় প্রভৃতি মহাকবিগণ মহাযত্নেও তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ভূতভাবন্ ভবানীপতি তাই এই স্থান নিজবাসের উপযোগী ভাবিয়াছিলেন। আমরা মর-জীব, এই অমর ধামে কত দিন থাকিতে পারিব? তাই শীতে ভীত হইয়া পলাইতেছি। ইহাতেই বুঝিতে পারিবে, আমাদের বল বিক্রম কত দূর। যাত্রিগণ যথা স্থানে প্রস্থান করিতেছে, আমরা লোকালয় খুঁজিয়া লইতেছি, আর ভগবানের সেবক মহর্ষিগণ সেই অমর-নিকেতনে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতেই বুঝিয়া লও, আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কতদূর পার্থক্য! আজি কালি কাশ্মীর মেওয়া ফলে পরিপূর্ণ, ঘাটে, পথে, মাঠে, বাগানে, মেওয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, সকল বাগানে ফলভরে বৃক্ষ সকল অবনত; কচি, ডাঁসা, পাকায় বিভুষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ফল খাইতে, কিম্বা লইতে কাহারও বাধা নাই। "গোযবগু্য" নামক ফল অতি চমৎকার। তাহা পাকিলে দুই দিনের অধিক থাকে না, তাহার ন্যায় মধুর ফল আমি পূর্ব্বে কখন খাই নাই; দেখিতে ঠিক বড় লম্বা পেয়ারার মত, ভিতরে ক্ষীর পূর্ণ। মধুর অপূর্ব্ব আর কত রকম ফল আছে, তাহার নাম কাশ্মীরী ভাষায় বড় লম্বা, এই জন্য লিখিলাম না, শ্রীনগরে অদ্যাপি অধিক শীত হয় নাই। সুতরাং আজি কালি বড় আনন্দ। আমরা এই মধুময় আনন্দ

উপভোগ করিতে করিতে দেশাভিমুখে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছি। ভরসা করি, শারদীয় উৎসবে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিব।

জয় জগদীশ হরে।

সম্পূর্ণ।